মানস-সরোজিনী।

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত।

কলিকাতা,
১৭নং জেলিয়া পাড়া লেন, বহুবাজার হইতে
শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৩ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

কলিকাতা ;
১৪ নং মদন বড়ালের লেন,
লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে
শ্রীমাণিকচন্দ্র ঘোষ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
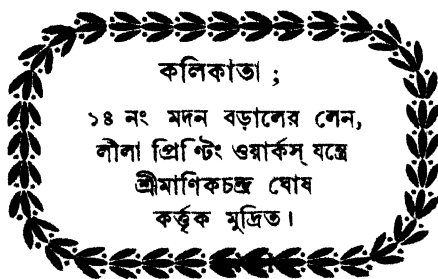
নিবেদন।

পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় স্নেহ-সম্ভাষণে গ্রন্থকারকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, সেই পত্রখানি এই গ্রন্থের ভূমিকারূপে প্রদত্ত হইল।

বিনীত—

প্রকাশক।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

পরমকল্যাণভাজন শ্রীমান্ মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

চিরজীবেষু—

ভ্রাতঃ!

ভাবসৌন্দর্য্যে তোমার 'মানস-সরোবর' অতি মধুর। সরোবরের কমলিনী যেমন সূর্য্যমুখী, তেমনি তোমার "মানস-সরোবরের" কবিতা ঈশ্বরমুখী। বালাতপের ন্যায় ভগবৎপ্রেমে তোমার "মানস-সরোবর" স্থানে স্থানে অনুরঞ্জিত। তোমার পদ্য ও গদ্য উভয়ই আমার মিষ্ট লাগিয়াছে। তুমি ভক্তিমান্ চিত্রকরের ন্যায় নীতি ও প্রীতির পবিত্র চিত্র প্রদর্শনে কৃতকার্য্য হইয়াছ। তোমার ভাষা সরল ও মধুর।

তুমি যেখানে ভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছ—

"শুনিয়াছি লোক মুখে
একা যে পড়িয়া দুখে,
তোমারি শরণ লয়, বন্ধু তুমি হও তার,
তবে ত আমার তুমি, একা আমি নহি আর।
একা আমি নহি আর, বন্ধু তুমি নারায়ণ;
তুমি যার আপনার দুঃখ তার উদ্‌যাপন"—

সেখানে যে কত কথা, কত ভাবই ব্যক্ত করিয়াছ তাহা ভাবুক ভিন্ন বুঝিতে পারে না। তোমার "প্রাণের আলোক," "মিলন ও বিচ্ছেদ," "ভয়," "আমি" প্রভৃতি পড়িতে পড়িতে মনে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব আসে, তাহা তোমার ভাষাতেই বলি—

'ভাবাবেশে স্মৃতি যেন বিস্মৃতি সাগরে—
অপার আনন্দবেগে পড়ে যায় ঢলি।"

"প্রকৃতির শোভা নাই," "ফিতা" প্রভৃতি পড়িয়া না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই। কিন্তু দার্শনিক বিচার করিয়া তাহা এমনি ভাবে চিত্রিত করিয়াছ যে, মনে হয়, তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা বুঝি অভ্রান্ত। চিরজীবী হ'য়ে থাক ভাই—আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কবিত্বশক্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হউক।

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, প্রতিভা ও কৌলীন্য, এগুলি তোমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। তোমার প্রাতঃস্মরণীয় জ্যেষ্ঠতাত ৺প্রসন্ন-কুমার সর্ব্বাধিকারী, তোমার পিতৃদেব ডাক্তার ৺সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী রায়-বাহাদুর, তোমার পিতৃব্য সব-জজ শ্রীযুক্ত

আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী রায়-বাহাদুর, এবং তোমার অগ্রজ ডাক্তার শ্রীমান্ সত্যপ্রসাদ, এটর্ণি শ্রীমান্ দেবপ্রসাদ এম, এ, উকীল শ্রীমান্ কৃষ্ণপ্রসাদ এম্, এ, ডাক্তার শ্রীমান্ সুরেশ প্রসাদ এম, ডি, প্রভৃতি সকলেই বিদ্যায় ও যশে সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। আজি সেই মহাবংশের সন্তানকে মাতৃভাষার সেবায় ব্রতী দেখিয়া অপার আনন্দলাভ করিয়াছি। ভাই! "মাতৃভূর্মাতৃভাষা চ প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়া মতা"—এ কথা প্রাণান্তে ভুলিও না।

২রা আগষ্ট, ১৯০৬।
২৫নং, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শুভানুধ্যায়ী—
স্বস্তি শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

পুনশ্চ—

আমি জ্ঞাত আছি, তোমার পুণ্যাত্মা প্রপিতামহ ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণের আদর্শ ছিলেন। সঙ্কটাকীর্ণ সিপাহী-বিদ্রোহ-কালেও তিনি পদব্রজে ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া, নিজ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সাধনাবলে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ভগবৎসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সে সকলের হস্তলিপি তোমাদের গৃহে বিদ্যমান। সেই পুণ্যশ্লোক ৺পিতামহের কৃতি ও কীর্ত্তি প্রচার করা তোমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। সৌভাগ্যবশতঃ তুমি আজি মাতৃভাষায় দীক্ষিত, এ পবিত্র কর্ত্তব্যভার তোমারি গ্রহণ করা উচিত।

স্বস্তি শ্রীতা—

সূচীপত্র।

পদ্যাংশ।

(গদ্যাংশ।)

মানস-সরোবর।

ভাগীরথীর প্রতি।

কল-কল-নিনাদিনী পয়ঃ-প্রবাহিনি !
ভৈরবী মূর্ত্তিতে কোথা করিছ গমন ;
আত্মহারা কেন তুমি জগত-জননি,
কেনই বা নাচাই'ছে চঞ্চল পবন ?
আর্য্যসুত ভক্তিভাবে পূজে মা' তোমাবে,
মাতা বোলে তোমারে মা' মনে দেয় স্থান ;
দেখাইছ কেন ভয় ভীষণ আকারে,
দেখা'ওনা বিভীষিকা নিঠুরা সমান !
প্রবল প্রবাহ তব সহিতে না পারি',
গেল কত দীনাশ্রম—পর্ণের কুটীর।
হইবে না তবু শান্ত, এ কেমন নারী,
যৌবন কালেতে মন এতই অধীর !
ধনীর দুয়ারে তুমি কদাচিৎ যাও,
এ কেমন রীতি তব কুল-কমলিনি ?

দীনের দুর্দ্দশা করি' বাসনা পূরাও,
হেন পক্ষপাতে কি মা' নহ কলঙ্কিনী?
সদা তুমি অধোমুখে [illegible] গো গমন,
উচ্চভূমে তোমারে মা' দেখা নাহি যায়;
কালস্রোতে তব বক্ষে জীবজন্তুগণ,
ভেসে ভেসে স্রোত-বেগে জীবন হারায়।
কি কারণে তব নাম পতিতপাবনী,
ভাবিলে সংশয় মনে হয় মা' উদয়;
কেন এত প্রাণিবধ করগো কল্যাণি,
বলিতে কি পার কিছু করিয়া নিশ্চয়?
ধরিয়াছ সপ্তশিশু বসু-আখ্যাধারী,
গর্ভে ধরি' যাহাদের পেয়েছিলে কোলে;
সেই জন্য হয়েছিলে শান্তনুর নারী?
তবু তুমি পুত্রবতী ভীষ্ম ছিল বোলে!
বুঝিনা মা' তব মায়া, নাহি কোন জ্ঞান,
অন্তিমে রাখিও দেবি! ও রাঙ্গা চরণে;
শেষদিনে যেন মাতঃ! পোড়া এ পরাণ
জ্বালা ব্যথা নাহি পায় শমন-পীড়নে।
না জানি ভকতি স্তুতি মূঢ়মতি আমি,
কিছু আমি নাহি জানি মহিমা তোমার;
মুক্তি দিও মুক্তিদাত্রি! আমি মুক্তিকামী,
উদ্দেশে শ্রীপদাম্বুজে কোটি নমস্কার।

শিশুর চিত্র।

গাল দুটী ফুলাইয়ে, হাস শিশু একবার
মুগ্ধ কর সবে ;
তব হাসিভরা মুখে, অপার্থিব ভালবাসা,
নাহি থাকে কবে !
যে চায় তোমার পানে, তাহারি হৃদয় যেন
সব দুখ ভোলে ;
মোহিত হৃদয়ে তোরে, ওরে শিশু অতুলন,
তুলে নেয় কোলে।
স্নেহ-ভরা চ'খ দুটী, কি যেন কি কথা কয়,
ভাবি মনে মনে ;
প্রাণে কপটতা নাই, প্রাণ পুরে ভালবাস,
সম সর্ব্বজনে।
স্বরগের পবিত্রতা, পাইয়াছ তুমি সব
নাহিক বিকার ;
শত্রু মিত্র ভিন্নভাব তোমার নিকটে শিশু,
কেন র'বে আর !!

বিদগ্ধা সাবিত্রী।

কোথা নাথ ! প্রাণেশ্বর, প্রাণের অধিক,
ছাড়িয়া আমারে তুমি করিলে গমন ;
ঘোর অন্ধকার এ যে বাড়ি'ছে ক্রমিক,
ত্বরা করি' উঠি' চল আপন ভবন।

জীবনের ধ্রুবতারা তুমি গো আমার,
দুখিনীর ধন তুমি অখিল সংসারে ;
মৃত্তিকা-শয়ন নাথ, না সাজে তোমার,
উঠ উঠ—চল যাই আপন আগারে।
মহর্ষির বাক্য বুঝি ফলিল আমার,
তাই বুঝি প্রাণনাথ কথা নাহি কয় ;
সোণার সংসারে তবে দিয়া ছারখার
যাইব নাথের সাথে শমন-আলয়।
কেনরে বিদগ্ধ প্রাণ ! এ পোড়া শরীরে,
রয়েছ সহিয়া ক্লেশ এতেক প্রকার ?
এখনো স্ফুরিছে বাণী হুতাশে মরি রে,
ধিক্, এ অবলা প্রাণে, ধিক্ শতবার !
কা'বা ওরা চারিজনা ! এ ঘোর-তিমিরে,
হাতে ধরি' নাগপাশ কর্ব্বুরের প্রায় ;
এ বিপাকে দয়া ক'রে তারিতে দাসীরে,
প্রেরিলা কি দয়াময় ওদের হেথায় ?
না ! না ! বুঝি যমদূত ! মম পতি লাগি'
আসিছে ভীষণ বেশে অভাগিনী-পাশে।
দূরে স'রে যারে তোরা ; কভু এ অভাগী—
ছাড়িবে না পতি-পদ যম-নাম-ত্রাসে।
সতী আমি, বাক্য মম করিয়া হেলন,
আসিস্ যদ্যপি তোরা—পা'বি প্রতিফল ;
সতীবাক্য কভু নাহি হইবে খণ্ডন,
ত্রিভুবনে সতীবাক্য না হয় বিফল।

এ ঘোর আঁধার বনে আর কাঁদিব না,
তোদের বিকটরূপে ভয় না করিব ;
সতীর পতির পাশে আসিতে দিব না,
কাহাকেও ডরিব না,—বরঞ্চ মরিব।
কুলবতী সতী আমি একাকিনী বনে,
শুন দূত! এ প্রতিজ্ঞা—জীয়াইব পতি!
যাও চলি, এ মিনতি জানা'ও শমনে—
"আহ্বানে সাবিত্রী তোমা বিরহিণী সতী।"

তান্তিয়া ভীল।

শারদী পঞ্চমী তিথি আমন্ত্রি দুর্গারে
নিদ্রিতা হইলা যেন শিখরের কোলে
প্রদোষে। উদয়াচলে শারদ আকাশে
দেখা দিলা পঞ্চমীর দশ-অংশ-শশী—
ধবল-শিখর-শিরে ; এদিকে সহসা
বাহিরিলা মূর্ত্তি এক শৈলেশ্বর-চূড়ে ;—
দীর্ঘশ্মশ্রু, শ্বেতবর্ণ, হস্তে স্বর্ণতুরী,
প্রসন্ন বদনকান্তি ;—তখনি মলিন,
সতেজে স্ফুরিল আস্য তখনি আবার।
বীরজ্যোতি খেদাইলা সে মালিন্যে দূরে।
কহিলা সে মূর্ত্তিবর গভীরে গর্জ্জিয়া
কাঁপাইয়া গিরিগাত্র, বোধ হৈল যেন—
কাঁপিল জলদদল শেখর গগনে।

কহিলা সে দিব্য মূর্ত্তি—"আসিয়াছি আমি—
"তান্তিয়া ভীলের আত্মা—অনন্ত ভ্রমিয়া,
দেখিতে কেমন আছে ভারত-সন্তান।"
নীরব হইল বাণী ক্ষণেকের তরে;
শ্রবণে বহিলা বায়ু তখনি আবার
মনোহর এই গীতি তূর্য্যধ্বনিসহ।
"জন্মদিন হ'তে আমি পরহিতব্রত
করিয়াছি জীবনের একমাত্র সার;
পরহিত তরে আমি হ'য়ে ব্যাকুলিত,
ঘুরিয়াছি চারিদিকে করিতে উদ্ধার।
ভয়াতুর জনে আমি অর্পিয়াছি কোল,
পীড়িতের দ্বারে আমি হয়েছি সেবক;
দীনের কারণে আমি হইয়া বিভোল,
বিঁধিয়াছি বহুবক্ষে অস্ত্রের ফলক।
যদি কেহ থাক মোর আপনার বোলে
চাহিও দীনের প্রতি সন্তানের ন্যায়;
কাঁদিলে সাদরে নিও তব নিজ কোলে;
শান্তি দিও আহা বোলে স্নেহ মমতায়।"
থামিল শোকের তুরী, থামিল সঙ্গীত,
অকস্মাৎ তুরী সহ মূর্ত্তি অদর্শন;
কাতর হইয়া গেল ডাকিয়া ডাকিয়া,
ভারতের শান্ত ছেলে দিল না উত্তর।

মাতৃস্নেহ।

জননী-জঠরে
হ'য়ে অন্ধপ্রায়,
ছিলাম যেদিন আমরা সবে,
কতই যাতনা
পেয়েছি—দিয়েছি,
কত কষ্ট দিয়া এসেছি ভবে।
লইয়া জনম
এ পাপ-ধরায়
দিবারাতি শুধু কাঁদিতে আছি ;
কোন্ মহোদয়
এই মায়াময়
সংসারে আমার—কেমনে বাঁচি!
কেবলি ক্রন্দন
যবে হয় সার
ক্ষুধার জ্বালায় খাবার লাগি ;
কেহ ত আসে না
বিহনে জননী—
জননী শুধুই দুখের ভাগী।
দিয়া স্তন কোল
ভুলান আমায়
কতই আদরে মধুর বোল ;

পারি না করিতে
গুণের গণনা,
স্বরগ বিমল মায়ের কোল।
মল মূত্র আদি
স্বহস্তে লইয়া
করেন ক্ষালন দুখিনী মাতা;
জননীর স্নেহ
সুধা হ'তে সুধা,
হৃদিমাঝে স্নেহ-বিছানা পাতা।
অসুখের দিনে
হইয়া ব্যথিত,
কতই রোদন করেন বসি';
কিছু ভাল হ'লে
হাসেন আবার
হেরিয়া সুতের বদন-শশী।
হেন দয়াবতী
জননীকে ওগো,
কি দিয়া অর্চ্চনা করিতে হয়;
জানিনা সে নাম,
কিবা উপহার,
অর্পিব মায়েরে—স্নেহ ত নয়।
সে স্নেহের ধার
কে পারে শুধিতে
মায়ামঙ্ক এই অবনী-তলে?

পুত্র-শোকাতুরা—
জননী-রোদন
দেখিলে শুনিলে পাষাণ গলে।
ওগো পরমেশ!
বোলে দাও মোরে
এ মাতার ঋণ কেমনে শুধি।
মাতারে সেবিব
দিবা বিভাবরী
মনে বড় আশ—হইব সুধী।

হৃদয়।

কি জিনিস তুমি যে হৃদয়,
বুঝাইতে পার কি আমায়?
তব স্থান রতি-পরিমাণ
তাহাতেই এত বলধাম্!
শরীরের মধ্যস্থলে গুহ্যতম দেশে,
সতত করহ বাস অভিনব বেশে।
এ প্রকাণ্ড বিশ্ব তব ঠাঁই,
মনে হয় কিছু যেন নাই;
ভাবিতেছ এই এক দেশ,
ভাব পরে আকাশের শেষ।
দেখ নাই, অনুমানি, কভু হিমাচল,
ভাব তবু তার কথা শুনিয়া কেবল।

এইবার আর এক কথা,
সংসারের সুখ দুখ ব্যথা—
ছিলে এই জগতের রাজা,
প্রজাগণে দিতেছিলে সাজা ;
ক্ষণপরে ভেঙ্গে গেল স্বপনের ঘোর,
উদরের দায়ে যেতে হ'ল দোর দোর।
দেবসম ছিলে এতক্ষণ,
নর-দুখ করিতে মোচন ;
ক্ষণপরে আসিল সংশয়,
ট'লে গেলে তুমি রূপময়,
করিলে পত্নীর গলে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত,
তিতিল ধরণীতল রক্তে রক্তপাত !

দাস্যভাব।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলরাম।)

—:০:—

প্রেমময় তোরে হরি বড় ভালবাসি।
কে জানে কেন এমন
হয় বিচঞ্চল মন,
আপন করেতে আমি পরিয়াছি ফাঁসি,
পোড়া লোকে ছলে বলে করে তোরে দোষী।

আধ আধ আধ রবে
দাদা বলে ডাক যবে
বপু পুলকিত হয়—জুড়ায় জীবন,
সকলি করিতে পার আমার কারণ।
বিপদ হইলে মোর,
উছলিত চিত তোর,
কেমনে নিস্তার পা'ব—তাহারি ভাবনা!
একা তুমি অবগত আমার বেদনা।
তব মাতা, মম মাতা—
নহে তুই, জানি ভ্রাতা!
তথাপিও লোকে বলে বিবিধ প্রকার;
তোমারি মায়ায় তুমি হও চমৎকার।
তোমার কণ্ঠের স্বর
হয় মনোমুগ্ধকর,
লোচনে বদনে ঝরে প্রেমের মাধুরী,
সে প্রেমে উজান বয় যমুনালহরী।
কে যে তুই, কে যে আমি,
কেন বা সংসারে ভ্রমি,
ভুলে যাই সে সময়—থাকে না চেতন,
স্থিরনেত্রে দেখি শুধু নীলিম গগন!
শৈশবে ব্রজেন্দ্রপুরে
মিলি' যত সহচরে
করিতাম কত খেলা নিতুই নূতন,
সে খেলার ভাব কিন্তু বুঝিনি তখন।

ক্রোধবশে যবে তোরে
বলিতাম কটু-স্বরে
হাসিয়া হাসিয়া তুমি চকিতে তাকায়ে
মিষ্ট ব'লে তুষ্ট ক'রে শান্তি উপজিতে।
কুরুক্ষেত্রে মহানাশ—
করি মনে অভিলাষ
সখার বাজির বল্গা করিয়া ধারণ,
দেখায়ে'ছ জগতেরে কর্ত্তব্য-সাধন।
তুমি আমি একপ্রাণ
থাকে যেন এই জ্ঞান,
জনমে জনমে যেন পাই দরশন,
কর্ত্তব্য সাধিতে যবে মর্ত্ত্যে আগমন।
কিছু না বাসনা আর,
যুগে যুগে অবতার,
পাই যেন দেখা তব আমার কানাই,
কালা হও গোরা হও কিছু ক্ষতি নাই।

কৃষ্ণস্তোত্র।

নমঃ নমঃ কৃষ্ণচন্দ্র মথুরার পতি,
তোমা বিনা মানবের নাহি অন্য গতি,
নমস্তে দেবকীসুত নররূপধারী,
তুমি বিনা জগতের কেবা হিতকারী।

বিদীর্ণ করিলে ক্ষিতি বরাহের রূপে,
নৃসিংহ মূরতি ধরি' মার হিরণ্যকশিপুকে !
মোহিনীর কায় তব সমুদ্র মন্থনে,
কৃষ্ণ অবতার তব ভূভার হরণে।
কভু বুদ্ধ কভু তব বামনের ছল,
পুরুষ প্রকৃতি তুমি, দুর্ব্বলের বল।
রাবণারি হয়েছিলে জানকীর আশে,
ক্ষত্রিয়-দৌরাত্ম্য লোপ তোমারি প্রয়াসে।
অপূর্ব্ব চৈতন্যরূপে আসিয়া ধরায়,
ভাসাইলে জীবলোক প্রেমের ধারায়।
শঙ্কর, জেহোবা, কল্কি, তুমিই সকল,
মহম্মদ, গড্ আর জর্ডানের জল।
কুরুক্ষেত্রে রুদ্ররূপ, দ্বারকায় রাজা,
গোকুলে শৈশবলীলা, রাইরাজ্যে প্রজা।
সমুদ্রের জল তুমি, মরুভূমে বালি,
সুরেন্দ্রের শচী তুমি, শশাঙ্কের কালি।
নিশ্বাসে পবন তুমি, বিটপীতে রস,
কালের শমন তুমি—কারো নহ বশ।
দেবতা তেত্রিশ কোটি তুমিই স্বরূপ,
আমি অজ্ঞ কি বুঝিব তুমি যে কিরূপ.
রাখিও রাতুল পদে অন্তিম দশায়,
আমার যা আছে, প্রভো ! দিলাম তোমায়।

কে তুমি মা!

কে তুমি মা! সিংহপৃষ্ঠে কনকবরণি—
দশভুজে, ত্রিনয়নে, কি নাম তোমার?
দুর্দ্দান্ত মহিষাসুরে করিবারে বধ
ধরিয়াছ মহাখড্গ সুকোমল করে।
অহো! বুঝিয়াছি তুমি শৈলেন্দ্রনন্দিনী;
পড়েছে কি মনে দেবি, নির্জ্জীব ভারতে?
কি দেখিতে আসিয়াছ উমে? আর নাই
সে ভারত, যথা তব স্নেহের নন্দিনী,
বীণাপাণি সৃজেছিলা ব্যাস কালিদাসে।
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার গেছে জলধির পারে;—
এবে ভারতসন্তান ভুলিয়াছে তোরে,
করে না বিহিত পূজা বিহিত সম্মানে।
মদ্য মাংসে পূজা করে বারাঙ্গনা ল'য়ে,
পরম বৈষ্ণবী তুমি, একি পূজা তোর!
ডুবাও ভারতসুতে জলধির তলে।
মাতৃপূজা যেবা নাহি করে, অনাচার
ব্যভিচার কাম্য মাত্র যার, জীবনেতে
কি কাজ তাহার! পাপে ভরা হায়, আজ
জগৎ সংসার! তবে কেন আর দুর্গে,
তবে কেন আর! শুন দেবি, কর লুপ্ত
ভারতের নাম; হাসিবে না শত্রুবর্গ
অঙ্গুলী হেলা'য়ে, ভারতের শোচনীয়

পরিণাম হেরি। তবে যদি থাকে সাধ
ভারতে তারিতে, এস উমে শিবেশ্বরি,
হৃদয়-আগারে,—সমস্ত সন্তান মিলে
ধোয়াইব ও রাঙ্গা চরণ! ভক্তিপুষ্পে
পূজিব তোমায়! সর্ব্বময়ি শিবদাত্রি,
পটে তোরে পূজিবনা আর। হৃদয়ের
অন্তস্তলে বসা'য়ে আদরে, এস শিবে,
করি পূজা, মিলি যত ভারত-সন্তান।

চন্দ্রের প্রতি।

দিবস হইলে গত ধীরে শশধর,
হও আসি' গগনে উদয়, উজলিয়া
ভূমিতল রজত-কিরণে! কেন আর
হাসিরাশি ঢালিছ ভুবনে? একি হাসি
সুধাংশু তোমার? দীন যবে কাঁদে পড়ি
অন্ন পাইবারে, পুত্র যবে মাতৃহীন
হ'য়ে ফেলে অশ্রুজল, তখনত হাস
তুমি রঙ্গভরা হাসি! ধনী, গৃহছাদে
বসি, চায় যবে হেরিতে তোমায়, হায়
সসম্ভ্রমে দেব তুমি তারে। হে শশাঙ্ক!
একি রীতি তব—দেব! বিরহকাতরা
প্রণয়িনী যবে, ভাবে মনে পতিরূপ,
তাকাও তাহার প্রতি উপহাস ছলে।

সুধাকর, একি তব অন্যের আচার ?
কিন্তু আছে তবু গুণ। সর্ব্ব জীবে কর
তুমি স্নিগ্ধ রশ্মিদান—চণ্ডাল অবধি
নাহি হয় নিরাশিত। তব আগমনে
হাসে সবে— সুধাময়ী বিকচ কুমুদ ;
কিন্তু হায় বিষাদিতা সূর্য্যমুখী। হাসে,—
নাচে চকোর দেখিয়া তোমা শ্বেত নভঃ-
স্থলে, কিন্তু কাঁদে অন্য বিহগ-শাবক।

প্রেম-আলাপনে রত নব দম্পতীর
মনোমুগ্ধকর তুমি ; বিরহকাতরা
কুল-কমলিনী মুদে নেত্র, নিরখিয়া
তোমার ও প্রেমময় রূপ। এস তুমি
কাহারও বা ঘটাতে জঞ্জাল, প্রফুল্লিত
কর কারে দেখা'য়ে কৌতুক। এক রূপে
কর তুমি প্রেম-আলাপন, অন্যরূপে
বিষাদবর্দ্ধন। কি বুঝি মহিমা তব
মায়াবদ্ধ আমি। যাচি ভিক্ষা তব ঠাঁই
যেন অন্তিম সময়ে পাই তব শুভ্র
পবিত্র আলোক, যাহে উতরিতে পারি
নরকের অন্ধকার পথ। অন্ধকারে
পাই যেন তব দরশন। সে সময়ে
থেক' না থেক' না দেব, মেঘের আড়ালে।
লও এবে অধীনের উদ্দেশ-প্রণাম।

দিদিমার গান।

তমিস্রা রজনী ঘোর বিকট আকার,
শৃগাল কক্কুর সবে করিছে চীৎকার।
এমন সময়ে এক ভীষণ আরাব,
পশিল শ্রবণ-পথে, নাহি তার ভাব।
কেঁউ কেঁউ মিউ মিউ কুটুর কুটুর
হাম্বারব, সিংহনাদ, রাসভের সুর;
কাহারো সহিত নহে উপমা তাহার,
মিষ্ট নয় তিক্ত নয়, অতি চমৎকার!
বলিতে কি হবে আর কি রূপ সে স্বর?
যা শুনিলে শ্রবণেতে দিতে হয় কর!
সে যা হোক, বলি তবে কিসের আ(ও)য়াজ,
পরায়েছে মোরে আজ ভাবুকের সাজ।
নিষ্ঠা ক'রে ভক্তিভরে শুন দিয়া মন,
হাসিতে বাসনা হয়, হাসিও তখন।
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বাঁন",
এই সুরে দিদিমাটী ধরিয়াছে গান।
গানের একটী পদ বুঝা নাহি যায়,
ফরাসির চন্দ্র বিন্দু মিশিয়াছে তায়।
সঙ্গীতের রব শুনে প্রাণে লাগে ডর,
মনে হ'ল স্কন্ধকাটা আসিয়াছে ঘর।
এ সুর ভূতের নয়—দিদিমার গান,
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান!"

নেহারিয়া ঘন মেঘ আকাশের তলে,
দিদিমা গাইছে গান ভুলাইতে ছেলে।
জাগিল পূর্ব্বের স্মৃতি হৃদয়ে আমার,
দিদিমার রূপ-কথা ছেলেবেলাকার !
ইংরাজী শিখিয়া আজ নাহি সেই প্রাণ;
আর নাহি চাই তাই শুনিতে সে গান ।
হায়রে এ কাল আর সে কালের কথা,
দু'য়ের প্রভেদ দেখে মনে পাই ব্যথা ।
জন্মান্তরে পুনঃ যবে হবে শিশুকাল;
ছাড়িতে না হয় যেন পুরাতন চাল ।
জন্ম জন্ম হয় যদি করিতে সংসার
পাই যেন শুনিবারে গান দিদিমার ।

উদয়াস্ত ।

পূরব গগনে রবি
ধরিয়া ধ্যানের ছবি
উকি ঝুঁকি মারিতেছে
বিটপী-আড়ালে থাকি ।
সুধীর মলয় বায়
বহিয়া বহিয়া যায়,
পিক-বঁধু কূজনিছে
গায় গান আর পাখী ।

নদীর ফটিক জলে
খেলে রবি কুতূহলে ;
লহরী দোলায় তারে
স্রোতে ভানু ভেসে যায়।
পশ্চাতে লহরী ছুটে
পড়িছে চরণে লুটে,
ডাকিতেছে তার-স্বরে,
রবি নাহি ফিরে চায়।
কমলিনী ফুলরাণী
বাড়াইয়া মুখখানি
হাসিল প্রেমের হাসি
হেরিয়া কান্তের লীলা ;
রবিও পুলক-ভরে
চুম্বিল অধর'পরে
পরাইয়া প্রেম-ফাঁসি
সোহাগে ধরিয়া গলা।
স্রোতস্বিনী—কল্লোলিনী
করিয়া কল্লোল ধ্বনি,
ডাকিল জগত-জনে
হেরিতে রবির রীত।
পক্ষপাত, অবিচার
যত দোষ আছে আর,
গাহে কুলু কুলু তানে
হইয়া একাগ্র চিত।

রবি খেয়ে তিরস্কার
করি মহা মার মার
উঠে ব্যোম-কেন্দ্র-দেশে
মধ্যাহ্ণ হইল তার।
পুড়িয়া আতপ-তাপে
বিশ্ব চরাচর কাঁপে;
ক্লিষ্ট জীব ভয়াবেশে
আবাসে পলায়ে যায়।
প্রচণ্ড সূর্য্যের দাপ
বাড়ে তার বারিতাপ;
সে বারি পিপাসু জন
তরাসে না তুলে খায়।
উত্তপ্ত নদীর জল
স্রোতে বহি অবিরল,
কমলে শুনায়ে গান
ক্ষমা-ভিক্ষা যাচে পায়।
কমলিনী অনুপমা
যাচে প্রিয়পদে ক্ষমা;
নহিলে জীবন তরে
জীব নাহি বাঁচে আর।
প্রেয়সীর অনুরোধ,
অথচ উদ্দীপ্ত ক্রোধ,
কেমনে প্রচণ্ড করে
থামিবে ভাবনা তার।

হইয়া অনন্তোপায়,
পশ্চিমে ক্রমশঃ ধায়,
তাহে হয় অস্তগামী—
লোহিত মুরতি খান।
সাধিয়া পরের তরে
দুখ আনিয়াছে ঘরে;
অস্তাগত তাই স্বামী—
সুদূরে চলিয়া যান।
কুলবধূ কমলিনী—
পতিশোকে উন্মাদিনী
ভাবিয়া আকুল প্রাণ,
দুলে দুলে কহে ব্যথা।
বিরহ-কাতরা অতি
কাঁদিল কতেক সতী—
আবার করিল মান,
বিরহী করয়ে যথা।
রবি বলে হাসি হাসি
পরায়েছ প্রেম ফাঁসি,
আবার আসিব ফিরে,
কি ভয় কমল তোর!
অস্তাচলে এবে যাই—
আমার বিশ্রাম-ঠাঁই;
মরি নাই ডুবে নীরে
আসিব হইলে ভোর।

প্রবাসে যাইলে পতি
অতীব বিষণ্ণমতি ;
অম্বর টানিল মুখে
কমলিনী রবি-সই।
আঁধারে ঘেরিল ধরা,
জীবন্ত হইল মরা,
পশু পক্ষী কাঁদে দুখে
হেরে নিশি মসীময়ী।

প্রার্থনা।

ওহে জগতের পিতা বিশ্বজন-ভয়ত্রাতা
তব গুণ কে কহিতে পারে।
তোমার মহিমা যাহা নরে নাহি জানে তাহা,
ভ্রান্তিময় অখিল সংসারে॥
তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি বন্ধু, তুমি ভ্রাতা,
তুমি সব বিশ্ব চরাচরে।
জীবের জীবন তুমি, তুমি জল, তুমি ভূমি,
তুমি আলো হও অন্ধকারে॥
তুমি বিষ্ণু তুমি শিব, তুমি আত্মা তুমি জীব,
তোমারি এ অনন্ত মহিমা।
ভাসায় ডুবায় জীবে, রাখে নরে রাখে দেবে
গায় সবে তোমারি গরিমা॥

তুমি কালী, তুমি তারা, সর্ব্বময়ী সারাৎসারা
অনশ্বর তুমি বিশ্বত্রাতা।
কভু অণু-ক্ষুদ্রতর, কভু বিশ্বরূপ ধর
কভু দানী, কভু হও দাতা॥
তুমি সূর্য্য, তুমি চন্দ্র, তুমি বায়ু, তুমি ইন্দ্র
তুমি শূন্য, তুমি হও স্থল।
তুমি দেব শূলপাণি, তুমি দেবী হর-রাণী
তুমি মুক্তি, তুমি মোক্ষফল॥
তুমি অগ্নি, তুমি যম, তুমি সত্য, তুমি ভ্রম,
তুমি কলি, তুমি ত্রেতা হও।
অবতার হ'য়ে কভু, তুমি পিতা, তুমি প্রভু,
জগতের পাপীরে তরাও॥
আমি অতি মূঢ়মতি, কি বুঝিব তব গতি,
তুমি হও অখিলের পতি।
তুমি ধাতা, তুমি পাতা প্রেমিক অভয়-দাতা,
যাচি সদা ও চরণে মতি—
ক্ষুদ্র আমি লও মম নতি॥"

নারী।

নারি! তুমি রমণীয় অতি!
কখনো জননী বেশে, পুত্রের মঙ্গলোদ্দেশে
নিজ প্রাণ তুচ্ছ ক'রে কর তার গতি;
তুমি রমণীয় অতি!

কখনো ভগিনী হ'য়ে, প্রীতি, যত্ন, স্নেহ দিয়ে
ভুলাইয়া দাও যত যাতনায় স্মৃতি;
তুমি রমণীয় অতি!
জীবন-সঙ্গিনী বামা, কভু তুমি মনোরমা,
প্রেমভরে সোহাগেতে বুকে ধর পতি;
তুমি রমণীয় অতি!
কভু তুমি বন্ধু হও, কভু দাসী-মত রও,
তোমারি তুলনা তুমি এ জগতে সতি;
তুমি রমণীয় অতি!
কিন্তু যবে ভয়ঙ্করী হও তুমি হে সুন্দরি,
সুদূরে পলায়ে যায় শকতি, ভকতি;
(তবু) তুমি রমণীয় অতি!
যতদিন বেঁচে রব, তোমার মহিমা গাব,
ব্রহ্মাণ্ডের আদ্যা;শক্তি, তুমি যে প্রকৃতি!:
তাই রমণীয় অতি!

নলিনীর প্রতি।

খোলগো নলিনি, বদনখানি।
কত আশা লয়ে তোমার নাগর,
মথিয়া মথিয়া প্রেমের সাগর
উদিবে অচিরে মেনে নাও বাণী;
খোল গো নলিনি, বদনখানি।

শিশিরের জলে মুখখানি ধুয়ে
উঠে বস ত্বরা রূপ বিকাশিয়ে
নিশা শেষ—ঊষা দি'ছে হাত-ছানি।
খোল গো নলিনি, বদনখানি।
ত্যজ ঘুম-ঘোর, চাহ চোখ মেলি,
উঠ উঠ সখি, অলসতা ফেলি,
বিলম্বে নাগর হবে অভিমানী,
খোলগো নলিনি, বদনখানি।
মেঘের আড়ালে এতক্ষণ থাকি',
হয়ত দেখি'ছে মারি' উঁকি ঝুঁকি,
তুমি গো কি ভাবে সাজিতেছ রাণি!
খোলগো নলিনি, বদনখানি।
দেখ চেয়ে দেখ সুদূর গগনে,
আলোকিত দিক্ লোহিত কিরণে,
বিহগ কূজিছে করিয়া মেলানি,
খোলগো নলিনি, বদনখানি।
জাননা ত সখি, ওই যে খেচর
ওরাই তোমার নাগরের চর,
ত্রুটিটী দেখিলে হবে কাণাকাণি,
খোলগো নলিনি, বদনখানি।
তারি করে দেবে তপনের কাণ
নীল নভে পশি শুনাইয়া গান,
লুকাইবে ভানু মেঘখানি টানি;
খোল গো নলিনি বদনখানি।

হয় ত বা প্রাতে উদিবে না রবি,
'বিরহযাতনা তুই শুধু স'বি,
অযথা বিলম্বে কাজ কি লো ধনি.
খোল গো নলিনি বদনখানি।

প্রতিশোধ।

একটী একটী করে কত দিন চ'লে গেছে ;
আমার হৃদয়-বীণা সেই সঙ্গে ভেঙ্গে দেছে।
একটী একটী করে যাহা ছিল ল'য়ে গেল ;
কঠিন পাষাণ সেই এ হৃদয়ে মারি' শেল।
তাহার আশায় যত কাঁদি আমি নিশিদিন ;
ফিরেও চাহে না সেই হেরে মোরে দীন হীন।
যে তারে বাজিত বীণা সেই তার দলি' পায়,
মধুমাখা হাসি হেসে কাঁদায়ে সে চলে যায়।
ভগন-হৃদয় তবু তারে পেতে হয় সাধ ;
এ কেমন ভালবাসা এতে নাহি অবসাদ !
সুধাংশু গগনে হাসে হেরে মোর দুরদশা ;
বিহগ কাকলী-ছলে বলে মম এ দুরাশা।
সুধীর মলয় দূরে হেসে হেসে চলে যায়,
তটিনী চলিয়া পড়ে হেসে হেসে পতি-গায়।
সলাজে নলিনী ঢাকে আপনার মুখখানি ;
ফুল্ল ফুলকুল সবে হেসে করে কাণাকাণি।
সরমের মাথা খেয়ে তবু তার পাছে ধাই ;
এত করি' পাছে ফিরি তবু তারে নাহি পাই।

আর তারে ডাকিব না ভাবিয়াছি এইবার ;
প্রকৃতি আশ্রয় করি' ভেবে নিব ছবি তার।
চন্দ্রমার পানে চে'য়ে ভাবিব সে প্রিয়ামুখ ;
দেখিব কেমন ক'রে দেয় এবে মোরে দুখ।
কোকিল পঞ্চম স্বরে মারিবেক যবে তান ;
মোহিত এ চিতে তবে ভাবিব সে তার গান।
সুনীল অম্বর হবে পরিধান বাস তার ;
তারকার হার গেঁথে ক'রে দিব অলঙ্কার।
কাদম্বিনী জড়াইয়া বেঁধে দিব কেশজাল ;
বালার্ক-সিন্দুর-রাগে সাজাইব তার ভাল।
চাঁপার আঙ্গুল গ'ড়ে দিব তার মুক্তাফল ;
দিবানিশি হাতে ধরি দেখিব সে কত ছল।
উষার বিমল হাসি দিব তার মুখে তুলে ;
প্রতি ভোর-বেলা উ'ঠে দেখিব সে মুখ খুলে।
লজ্জাবতী লতাটীর লাজময়ী হাব-ভাব ;
বসাইয়া দিয়া মুখে স্মরিব সে মুখ-ছাব।
অস্ফুট ভাষায় যবে নির্ঝরিণী ব'য়ে যাবে ;
প্রেমিকার প্রেম-কথা ভেবে আমি নিব তবে।
লাঞ্ছনা করেছে যত সব গুলি মনে আছে ;
আমিও তেমনি ক'রে ঘুরাইব পাছে পাছে।
আবার বাজিবে তবে হৃদয়ের তন্ত্রী মোর ;
এ যদি করিতে পারি' তবে হবে দুখ-ভোর।
কে কোথায় আছ ওগো শুন মম প্রতিশোধ ;
করিবারে পারিবে না কেহ মোরে প্রতিরোধ।

সরম-প্রতিমা।

প্রাণভরা আশা ল'য়ে সে আসে আমার কাছে,
সাধ হয় কথা কয়, কহিতে সে পারে না।
নীরব ভাষায় তার কহে কথা আঁখি দুটী,
নিমেষের তরে যেন তাহাতে সে থাকে না।
স্নেহ-সম্ভাষণে আমি আদর করিলে তারে,
নত মুখে নখ খুঁটে, মুখে কথা ফোটে না।
অন্য দিকে যেই ফিরি, সে চাহে আমার পানে,
ফিরাইলে মুখ আমি সে ত আর দেখে না।
থাকি যবে নিদ্রাভাণে, সে ব'সে শিয়র-পাশে
অনিমেষে চেয়ে থাকে চোখ তার পড়ে না।
যেই আমি চোখ মেলি, উঠে যায় তাড়াতাড়ি,
প্রাণান্তেও সে আমার কাছে আর রহে না।
কণ্ঠ কিম্বা পদশব্দ পায় যদি সে আমার,
আকর্ণ বিস্তার ক'রে স্থির থাকে—নড়ে না।
নিকটেতে যেই যাই, অমনি কাজের ছলে,
এটা, ওটা, সেটা ক'রে ভেঙ্গেও সে ভাঙ্গে না।
আমারি স্বাস্থ্যের তরে ব্যস্ত থাকে নিশিদিন,
একটীও কথা কিন্তু আমারে সে বলে না।
আমারি আশার আশে পথ পানে চেয়ে রয়
পশি কিন্তু গৃহে যবে, দেখেও সে দেখে না।
প্রতিদিন এই মত, চলিয়াছে অবিরাম
লাজ তার কিছুতেই টুটিয়াও টুটে না।

এমন সুধীর বালা জনমেও দেখি নাই,
কামিনীকুসুম মত ফুটিয়াও ফুটে না।

মিনতি।

ওগো ভেঙ্গে দাও ভুল!
আর যে রাখিতে নারি শীল মান কুল;
ওগো ভেঙ্গে দাও ভুল!
অতি পরাণ আকুল,
আমি নাহি পাই কুল,
আমার যে দুখ তার নাহি হয় তুল;
ওগো ভেঙ্গে দাও ভুল!
কি যে ব'লে গে'ছ কাণে
তাহা জাগে সদা প্রাণে
সেই হয়েছে ধেয়ান,
ভেবে হারায়েছি জ্ঞান;—
তাই করি অনুরোধ,
তুমি ফিরে দাও বোধ,
যা' করেছ, তা' করেছ ক'রনা বাতুল;
ওগো ভেঙ্গে দাও ভুল!
তুমি জগতের নও
কেন বৃথা আশা দাও;
আমার যে আশা তাহা অতীব বিপুল;
ওগো ভেঙ্গে দাও ভুল!

তুমি দ্যুলোকবাসিনী,
অয়ি মধুরভাষিণি!
সুধা-মাখা-হাসি হেসে ঘিঁধাওনা ভুল;
ওগো ভেঙ্গে দাও ভুল!
তুমি শুধু দেখিবার
নহ নহ ছুঁইবার,
আমি বুঝেছি তোমায়,
আর রেখ'না আশায়;
তোমার যে ভালবাসা বুঝেছি আমূল;
ওগো ভেঙ্গে দাও ভুল!

অনন্ত বিশ্বাস।

প্রভু! আমি তোমা ছাড়া নই!
ডাকি বা না ডাকি করে হাঁকা হাঁকি,
মনে জ্ঞানে তোমারই হই;
আমি তোমা ছাড়া নই!
প্রভু! আমি তোমা ছাড়া নই!
শয়নে স্বপনে কিম্বা জাগরণে,
হৃদি-মাঝে তব নাম লই;
আমি তোমা ছাড়া নই!
প্রভু! আমি তোমা ছাড়া নই!
তোমায় জানি না, কখন দেখি না,
তবু নাথ, তোমারেই ক'ই;
আমি তোমা ছাড়া নই!

প্রভু! আমি তোমা ছাড়া নই!
আঁখি-মন-লোভা প্রকৃতির শোভা
নেহারি মুগধ হ'য়ে রই;
আমি তোমা ছাড়া নই!
প্রভু! আমি তোমা ছাড়া নই।
কীট পরমাণু গ্রহ শশী ভানু
সকলি স্থজিত চরণে ঐ;
আমি তোমা ছাড়া নই!
প্রভু! আমি তোমা ছাড়া নই!
পাপ পুণ্য করি বাঁচি কিংবা মরি
সুখে থাকি কিংবা জ্বালা সই;
আমি তোমা ছাড়া নই!

মোহন-ছবি।

(বিদ্রূপ)

সাধের ফাঁসি গলায় প'রে
এত জ্বালাও সইতে হয়;
বল্‌তে পার শপথ করে
আমার কথা হয় কি নয়?
সবই জান সুধীর তুমি
একটুও ত অধীর নও;
জেনেও কেন, চাঁদবদনি,
মুখটী বুজে চুপটী রও!

এলুম আমি সোহাগ-ভরে
দেখ্‌তে তোমার বদনখানি।
কেমন ক'রে পরাণ ধ'রে
মুখ ঢাকিলে ঘোমটা টানি ?
হ'ল না হয় রংটা কাল
ক্ষতিই বা কি তোমার তা'তে ?
প্রাণ দিয়ে সই বাসি ভাল
তোমায় যে গো দিবস রাতে।
ভোমরা বধূ কাল-বরণ
তবু কুসুম আদর করে ;
বুকের মাঝে দিয়ে শরণ
বিলিয়ে মধু আপনি মরে।
মধু তোমার চাই না আমি,
আমার শুধু দেখ্‌তে সাধ ;
জানেন যিনি অন্তরযামী
তুমি কেমন সাধ্‌ছ বাদ।
পাজি পুঁথির দোহাই ছেড়ে
মুখটী তুলে একটীবার ;
বল আমায় চোখ্‌টী নেড়ে
"আমি তোমার, তুমি আমার।"
আদর করে জড়িয়ে গলা
ছড়িয়ে দিয়ে রূপের রাশি ;
নিরাশ-প্রাণের জুড়িয়ে জ্বালা
বল ওগো সই "ভালবাসি।"

আমি তোমার মোহন ছবি
তুলে দেখাই জগত-জনে ;
সেই ছবিতে অমর কবি
হ'বই হ'ব হয় ত মনে।
এখন তুমি হ'লেই রাজি
আমার যশের ধ্বজা উড়ে ;
হুকুম পেলেই কবি সাজি,
কলম্ চালাই তেড়ে ফুঁড়ে।

মেঘ।

মেঘ! তুমি বড়ই সুন্দর!
গোলগাল তব কায়, সুন্দর ভঙ্গিমা তায়,
আঁকা বাঁকা উচু নীচু রূপ মনোহর!
মেঘ তুমি বড়ই সুন্দর!

মেঘ! তুমি বড়ই সুন্দর!
বাষ্প হ'তে জন্ম তব কত রূপ নব নব
দেখাও তুমি গো মেঘ বৃষ্টির আকর!
ওগো তুমি বড়ই সুন্দর!

মেঘ! তুমি বড়ই সুন্দর!
সাড়া নাই শব্দ নাই জমিতেছ এক ঠাঁই,
মুহূর্ত্তেকে ছেয়ে ফেল বিশাল অম্বর!
তুমি মেঘ! বড়ই সুন্দর!

মেঘ! তুমি বড়ই সুন্দর!
চাতক তোমার তরে উড়িয়া পুড়িয়া মরে
দূর-শূন্য কোলে তব ছড়ায় সুস্বর!
সে সময় বড়ই সুন্দর!

মেঘ! তুমি বড়ই সুন্দর!
ছোট বড় পাখীগুলি আপন অস্তিত্ব ভুলি
তব হৃদে স্থান পেতে সদা যত্নপর,
মেঘ! তুমি বড়ই সুন্দর!

মেঘ! তুমি বড়ই সুন্দর!
করিয়া শরীরপাত ঢাল জল দিন-রাত
জন্মে তাহে শস্যরাজি ফলে তরুবর!
মেঘ! তুমি বড়ই সুন্দর!

মেঘ! তুমি বড়ই সুন্দর!
তোমার জলের বলে জলাশয়ে জল চলে
নহে শুকাইত কবে হ্রদ সরোবর!
তুমি মেঘ! বড়ই সুন্দর!

মেঘ! তুমি বড়ই সুন্দর!
তুমিই জীবের প্রাণ, অমৃত তোমার দান,
জীবিত তাহারি তরে ভূচর খেচর;
তুমি মেঘ! বড়ই সুন্দর!

মেঘ ! তুমি বড়ই সুন্দর !
গ্রীষ্মের নিবা'তে তাপ তড়িত তোমার দাপ
গরজনে তাই কাঁপে মেদিনী অম্বর ;
ওগো তুমি বড়ই সুন্দর !

মেঘ ! তুমি বড়ই সুন্দর !
সর্ব্বজীবে সম দয়া, এমন দেখিনি মায়া,
ধান্য-ক্ষেত্রে, কাঁটা-বনে ঝর ঝর-ঝর।
মেঘ ! তুমি বড়ই সুন্দর !

মেঘ ! তুমি বড়ই সুন্দর !
শুনিয়াছি শচীপতি মিনতি করিয়া অতি
চলে দূরান্তরে তব পিঠে করি ভর।
তুমি মেঘ ! বড়ই সুন্দর !

মেঘ ! তুমি বড়ই সুন্দর !
নামিলে ধরায় তুমি, পুণ্য হয় মর্ত্ত্যভূমি,
ভেকেরাও আনন্দিত, পড়ে থাক্ নর !
মেঘ ! তুমি বড়ই সুন্দর !

তুমি মেঘ ! এত যে সুন্দর !
এত যে তোমার দয়া, এত যে তোমার মায়া,
এত প্রেম ভালবাসা, এত যত্ন, এত আশা,
পাও তুমি কোথা হ'তে বল, যুড়ি কর।
কে দেছে জনম তব কোথা তার ঘর ?

পুরুষ কি নারী তুমি, বল মেঘ! বল তুমি
করো না বঞ্চনা মোরে, রেখ' না সংশয়-ঘোরে,
যে হও সে হও তুমি তোমাতে নির্ভর।
শিখাও অনন্ত প্রেম যুগ যুগান্তর।
বল বা না বল তুমি, মনে জানিয়াছি আমি,
নিশ্চয় কহিতে পারি, তুমি দেবতার নারী,
নারী বিনা কেবা বুঝে প্রেমের আদর!
পুরুষ পরুষ হয়, নহে ত সুন্দর!

উপহার।

সখি! এসেছি আমি দাঁড়ায়ে দ্বারে
বারেক আঁখি মেল গো!
তোমারি কারণে, প্রেম-উপহার,
এনেছি তুমি নাও গো!
বিরহ-কাতর প্রাণের বেদনা—
বুঝ গো সখি বুঝ গো!
মম হৃদয়-গাথা, মরম-ব্যথা
শুন গো সখি শুন গো!
কি করেছি দোষ—কেন অভিমান
বল গো তুমি বল গো!
দিবে দাও সাজা, স্মিত মুখে প্রিয়ে,
নিব গো আমি নিব গো!

করি অঙ্গীকার জীবনে মরণে
তোমারি আমি র'ব গো !
তোমারি প্রেমে মজিয়া মজিয়া
তোমারি শুধু হ'ব গো !
ত্যজ অভিমান, মিনতি আমার
একটী কথা কও গো !
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হেসে ডাক ঘরে
স্বরগ-দেশে যাই গো !
অয়ি মধুরভাষিণি সুধীর বালা
ধর গো সখি, ধর গো !
দু'টী অশ্রুবিন্দু প্রেম-উপহার
এ ছাড়া কিছু নাহি গো !

গান।

বিশদ জোছনা ফুটিয়াছে আজ
আঁধার গিয়াছে সরিয়া ;
ফুল, লতা, পাতা, আকাশ, প্রান্তর
হাসিয়া পড়িছে ঢলিয়া।
মেঘের উপরে নীল মেঘগুলি
চাঁদের পানেতে চাহিয়া,
অস্ফুট ভাষায় ইঙ্গিতে কহিছে—
"রূপে তারা গেছে মজিয়া।"

ভূধর, সাগর, হ্রদ, তরঙ্গিণী
জোছনা অঙ্গেতে মাখিয়া,
আনন্দের রোল তুলিয়াছে আজ
রূপের কিরণে ভাসিয়া।
বিটপীর নীড়ে রাতকাণা পাখী
গাহিছে থাকিয়া থাকিয়া,
চাঁদিনীর রাতে কে পারে থাকিতে
হৃদয়-আবেগ চাপিয়া?
মৃদু সমীরণ ফুলের সৌরভ
যতনে আনিছে বহিয়া,
তাপিত পরাণ যে যেখানে আছে
দিতেছে শীতল করিয়া।
চন্দ্রমাশালিনী এই যে যামিনী
শুধুই কি যাবে চলিয়া?
যদি ভাল লাগে বল তবে আমি
যামিনী পোহাই গাহিয়া।
তবে গাইব কি আমি গান,
খুলিয়া আমার প্রাণ?
ভাল মন্দ তত বুঝিতে পারি না
গাহিতে শুধুই জানি;
সুধাংশু-কিরণে বিভল পরাণে
শোন দেখি গানখানি:—
তুমি যাইবে গলিয়া গো,
তুমি ঢলিয়া পড়িবে গো!

চাঁদিনীর রাতে যাহাই গাহিবে
তাহাই হইবে গান ;
এমন সময়ে থাকিলে নীরবে
ফাটিয়া যাইবে প্রাণ।

নীরবতা।

আমি নীরবে গাইব, নীরবে রচিব মনের কথা,
আমি নীরবে বসিয়া নীরবে বলিব মনের ব্যথা ;
আমি নীরবে ডাকিব, নীরবে বুঝা'ব প্রাণের জ্বালা,
আমি নীরবে চুমিব, নীরবে পরা'ব গাঁথিয়া মালা ;
আমি নীরবে রচিব নীরব-শয়ন তাহার তরে,
আমি নীরবে ধরিব নীরব ভাষায় তাহার করে ;
আমি নীরবে চাহিব নীরব নয়নে সে মুখপানে,
আমি নীরবে ঢালিব নীরব প্রণয় তাহার প্রাণে ;
আমি নীরব সোহাগে নীরবে ধরিব তাহার গলা,
আমি নীরবে কাঁদিব, নীরবে কহিব তাহার ছলা ;
আমি নীরব হাসিতে নীরব সঙ্গীতে ইঙ্গিতে কব,
আমি নীরব করিয়া নীরব প্রেমেতে তাহারি হ'ব ;
আমি নীরবে নীরবে নীরবে মরিব তাহার পাশে,
আমি নীরব প্রণয়ী নীরব আমার কেবলি আসে।
নীরবই আমি ভাল বাসি,
নীরবেই আমি কাঁদি হাসি ;
তোমরা ডে'ক না আমায় ডে'ক না গো !
আমার নীরবতা ভেঙ্গে যাইবে গো !

অনুরোধ।

যাতনা সবে না প্রাণে
যাতনা সই! দিও না।
তোমারি মূরতি ধ্যানে
শুধু আমার বাসনা।
যেখানে যেমন থাক, মনে রাখ নাই রাখ,
তব তরে প্রাণ কাঁদে এই কথাটী ভুল না।
তবু যদি থাক ভাণে মরমে সই! সবে না।
কথা ক'ও, নাই ক'ও, প্রেম দাও, নাই দাও
অধীন আমি, নয়ন-বাণে "বধো না গো বধো না।"
যে জ্বালা সবে না প্রাণে এমন জ্বালা দিওনা।

আর কিছু নয়।

তোমার করেতে কর দিতে সাধ হয়;
বসিয়া থাকিবে তুমি
চরণ পূজিব আমি,
ঠেল না চরণে প্রভু, তুমি দয়াময়;
এই শুধু চাহি নাথ! আর কিছু নয়।

বন উপবন হ'তে তুলি' ফুলচয়
যতনে গাঁথিয়া মালা
সাজাব তোমার গলা;
ছিঁড়িও না তুচ্ছ ব'লে করি অনুনয়;
এই শুধু ভিক্ষা নাথ! আর কিছু নয়।

পূর্ণিমায় যবে ধরা হবে আলোময় :—
আসিয়া তোমার পাশে
বসিব নীরব ভাবে,
মুখ দেখে হারাইব আপন হৃদয় ;
এইমাত্র আশা মম আর কিছু নয়।

নীরবে দেউটী জ্বালি আঁধার সময়
তব ঘুমভরা চোখে
অনিমিষ দৃষ্টি রেখে
প্রেমের উদার ধ্যানে হ'ব তন্ময় ;
আমাব আকাঙ্ক্ষা এই আর কিছু নয়।

সারাদিন খেটে যবে আসিবে আলয় :—
দাসী রবে পাছে পাছে,
সেবা ক্রটী হয় পাছে ;
এই টুকু অনুমতি দাও সর্ব্বময়!
দাসী হ'তে চাই শুধু আর কিছু নয়।

জীবনে মরণে তুমি আমার আশ্রয়
যখন যেখানে থাক,
যখন যেমন রাখ,
পূজিতে থাকিব সদা ও চরণদ্বয় ;
এই মাত্র সাধ মম আর কিছু নয়।

মনের বাসনা।

নাথ! এ আমার অভিমান নয়,
প্রভু! এ আমার অহঙ্কার নয়ঃ—
মনে সাধ হয়,—
বসিয়া রহিব আমি একলা আঁধারে,
দীর্ঘশ্বাস ফেলে তুমি খুঁজিবে আমারে।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষে দেখা পাবে মোর,
আঁধারে ফুটিবে আলো, হইব বিভোর।
আরো মনে হয়,—
আদর কবিয়া তুমি নিকটে বসিয়া,
এই মুখখানি মোর বুকেতে চাপিয়া
সুধাবে আমারে "প্রিয়ে কেন আঁখিধার?"
রমণী-জনম হবে সার্থক আমার।
কভু ইচ্ছা হয়,—
মাথার উপরে যবে উদি' শশধর
ছড়াবে জগত-মাঝে স্নিগ্ধ শুভ্র কর,
তবে দিবে স্থান মোরে শ্রীচরণ-তলে;
ভিজা'ব চরণতল প্রেম-অশ্রুজলে।
পুনঃ মনে হয়,—
বারেক হাসিয়া তুমি আমারে হাসাবে,
বারেক নিশ্বাস ফেলি' আমাবে কাঁদাবে।
তুমি তরু আমি লতা হইয়া রহিব,
প্রাণ পূরে ভালবেসে জড়া'য়ে ধরিব।

নাথ! এ আমার অভিমান নয়,
প্রভু! এ আমার অহঙ্কার নয়—
এই সাধ হয়,—
হইব তোমার দাসী জনম জনম,
তুমিই হইবে মোর ধরম করম।
তোমার সোহাগে র'ব ইহাই কামনা,
অভিমান নয়, প্রভু, মনের বাসনা।

সখীর প্রতি।

সখি! ভাল যে বেসেছি,
সখি! কথা যে ক'য়েছি,
সখি! প্রাণ যে দিয়েছি,
তারে ওগো ভুলিব কেমনে?
ভুলিলে কি ভোলা যায়,
প্রাণ কি ভুলিতে চায়,
ভুলিতে যতন করি বাড়ে শুধু যাতনা;
কেমনে পাইব তারে, বল, সখি! বল না?
সখি! দেখা একদিন,
সখি! কথা একদিন,
সখি! হাসি একদিন,
করে কর রাখিয়া তাহার।

সেই দিন হ'তে সই,
আমি আর "আমি" নই,
কি জানি কেমন-ধারা হইয়া যে পড়েছি!
সেই দিন হ'তে পদে প্রাণ মন সঁপেছি।
সখি! আমি যে ললনা,
সখি! কি হবে বল না,
সখি! দিও না গঞ্জনা,
প্রাণ-হারা হইয়াছি আমি।
জীবন যৌবন মন,
করিয়াছি সমর্পণ,
দিয়া পুন ফিরে নিতে কে পারে বলনা সই?
বেঁচে আছি, তার আশে, সে আমার হল কৈ?
সখি! হারায়েছি মন,
সখি! কি হবে এখন,
সখি! বুঝ'গো বেদন,
পায়ে ধরি যাও তার কাছে।
আখি-জল দীর্ঘশ্বাস,
নিয়ে যাও তার পাশ,
বলো তারে তারি পদে প্রাণ মন সঁপেছি।
কি হবে আমার দশা, দাসী যে গো হয়েছি!

দাস-জীবনে প্রেম।

(পত্র)

মলয়া বহিতেছিল সাঁঝের আকাশে ;
পাখীগুলি করিয়া কুজন
যেতেছিল নীড়েতে আপন,
গগনেতে পঞ্চমীর চাঁদ,
উঁকি মারি' পাতি প্রেম-ফাঁদ
ঢলিয়া পড়িতেছিল কুমুদিনী পাশে—
নিরজনে প্রেমখেলা খেলিবার আশে।
তুলি' নদী কুলু-কুলু তান
আঘাতি' দুকূল গাহি গান,
যেতেছিল সাগর উদ্দেশে,
বীচিভঙ্গে দ্রবময়ী বেশে,
তারাহার আলোকিয়া পথ প্রেমিকার,
প্রেমরাজ্যে দিতেছিল আনন্দে সাঁতার,
অদূরে বসন্ত-অনুচর
ছড়াইতেছিল মধুস্বর,
বসন্তের নব ফুলদল
ছুটাইতেছিল পরিমল,
প্রীতি-ফুল্ল তরুরাজি, কুসুমিতা লতা,
বসন্ত-উৎসবে মাতি' গাহি' ছিল গাথা।
প্রাণাধিকা! প্রকৃতি নেহারি,
মুখচন্দ্র ভাবিয়া তোমারি,

আকুলিত পরাণ আমার,
দীর্ঘশ্বাস বহে অনিবার,
মরমের স্তরে স্তরে জ্বলেছে আগুন,
হায় বিধি! কেন তুমি আমারে বিগুণ!
আমি হায় উদরান্ন তরে
রহিবারে নারিলাম ঘরে,
তারে হায় ফেলিয়া এসেছি,
তারে ছেড়ে প্রবাসে রয়েছি
হায় বিধি! এ কি বিধি, দিয়া কেড়ে নাও,
দয়া কর দীননাথ! কিছু অর্থ দাও!
কিছু নিব সংসার পালিতে,
কিছু দিব অনাথে তারিতে,
কিছু দিব তোমার মন্দিরে,
কিছু দিব ভ্রাতায় ভগ্নীরে,
নিবনা সকল আমি প্রভু, দীননাথ!
দাও অর্থ জগদীশ! করি প্রণিপাত!
প্রভু! তব প্রেমের সংসার,
আমি শুধু হব ছারখার,
অর্থ তরে প্রেম শুকাইবে,
জগজ্জনে কলঙ্ক গাহিবে,
অর্থের বিহনে মম প্রেম ছুটে যায়,
তুমি প্রেমময় বিভু! দেখিবে না তায়?
যেই জন প্রেম নাহি জানে,
তারে দাও রত্ন থানে থানে,

সেই রত্ন ভোগ লালসায়,
মুহূর্ত্তেকে ধূলায় লুটায়,
প্রেম-রত্ন সে ত নাহি বুঝে বলে কারে,
তবু রত্ন ঢাল তুমি তাহার ভাণ্ডারে !
অর্থ পেলে ছাড়িয়া প্রবাস
চলে যাই আপন আবাস,
বাঁধি সেথা প্রেমের আলয়,
অনুভবি প্রেমের মলয়,
জোছনায় বেলাভূমে মুখোমুখি করি,
কুহুরব শুনি তবে প্রিয়া-গলা ধরি।
যদি প্রভু অর্থ নাহি দাও,
শশধর-জোছনা নিবাও,
কুহুরব কেন তবে আর,
মলয়ার কেন অধিকার,
থেমে যাক্ কুলুতান—নিভে যাক তারা,
প্রিয়ামুখ ভেবে নাহি হব আত্মহারা।
কুসুমের পরিমল যাক্,
কমলিনী হোক পুড়ে থাক্,
প্রকৃতির প্রকৃতিত্ব ক্ষয়,
কর তবে কর দয়াময়,
প্রবাসে দাসত্ব ক'রে কাটাইব কাল,
মনে নাহি পাবে স্থান প্রেমের জঞ্জাল।

অভিমান।

তুমি আসিয়াছ ?
বেশ, বোস ওইখানে, চেয়ে আকাশের পানে,
চেওনা আমার দিকে মিনতি তোমায়,
বিদলিতা লতা পানে কে চাহিতে চায় ?
তুমি আসিয়াছ ?
বেশ, কথা কহিও না, ভালবাসা জানা'ও না,
গোড়া কেটে তরু-শিরে ঢালিলে জীবন,
সে কি পায় পুনরায় ফিরিয়া জীবন ?
তুমি আসিয়াছ ?
বেশ, এস না নিকটে, যেন ছুঁয়ো না কপটে
আঘাতিত মৃগ-শিশু যদি নাও কোলে,
সে চাহিবে পলাইতে পাছে মার' বোলে !
তুমি আসিয়াছ ?
বেশ, দেবতার বেশে, ব'স দূরে হেসে হেসে
পূজি আমি দূরে থেকে তোমার চরণ,
আমি ত তোমারি নাথ, জীবন মরণ।
তুমি আসিয়াছ ?
বেশ, শুন নিবেদন, আজ ফুটেছে বচন,
তুমি ভাব—নাই ভাব, যেখানেই রও,
আমা হ'তে একতিল ছাড়া কভু নও।
উদ্দেশে চরণ তব ভাবি নিশিদিন,
আমি ত তোমারি ভাবে সদা উদাসীন

ইচ্ছা তব যদি হয়
বল "আমি" কেহ নয়,
তুমি আমি এক তবু, আলো ছায়া যথা,
চেওনা, ছুঁয়োনা কিন্তু, কহিও না কথা।

মান ভাঙ্গা।

আমি কি করেছি ?
আমি কি হয়েছি ?
আমি কি বলেছি ?
আমি কি চেয়েছি ?
কেন আঁখি ছল ছল, কেন কেন আঁখি-জল,
কেন গো মলিন তব সুন্দর বদন,
কেন মুখে নাহি সরে অমিয় বচন ?
(যদি) কিছু ক'রে থাকি,
(যদি) কিছু হ'য়ে থাকি,
(যদি) কিছু ব'লে থাকি,
(যদি) কিছু চেয়ে থাকি,
ভুলে যাও—এ মিনতি, তুমি ত আমারি সতি,
আমি ত তোমারি সখি ! চিরটী জীবন,
জেনে শুনে কেন তবে কর গো পীড়ন।
কি আছে আমার,
কিসের সংসার,
কার তরে আর
বহি চিন্তা-ভার,

তুমিই সম্বল মোর হৃদি-বিহারিণি!
তোমার কি সাজে মান—বল-ত মানিনি ?
যে রূপ তোমার
যে শক্তি তোমার,
যে রূপ আমার,
যে শক্তি আমার,
দুই রূপ—শক্তি মিলে সৃষ্টি রক্ষা করে,
সাজে না ত অভিমান এ শক্তি যে ধরে !
আদ্যা-শক্তি-ছায়া,
আদ্যা-শক্তি মায়া,
শিব শিব-জায়া
শ্যামা শ্যাম-কায়া,
তুমি ত তাহারি অংশ জীবন-তোষিণি !
আর কি করিতে পার মান লো মানিনি ?
পুরুষ শঙ্কর, মহাশক্তিধর,
তবু জুড়ি কর, পড়ে ভূমিপর,
বহিতে চরণভার শক্তির—শিবানি,
আমিও বহিব তব চরণ দুখানি।
যা' কিছু করেছি,
যা' কিছু হ'য়েছি,
যা' কিছু ব'লেছি,
যা' কিছু চেয়েছি,
সে কেবল প্রেম-খেলা, জেন' মনে স্থির
ভাঙ্গ মান—নহে পদে লুটাইব শির।

শেষ কাজ।

কেবা গায় বিষাদের গান,
উঠে কেন ক্রন্দনের রোল,
"কি হলো কি হলো বলি' উঠিতেছে তান,"
বিপদ কাহার ঘরে———কেন এত গোল!

অনাথার কাতর ক্রন্দন,
পিতৃহীন হইয়াছে সেই,
তাহার দুখের ভার করিতে বহন,
এ বিশ্ব-সংসারে হায় আর কেহ নেই।

পতি পুত্র কন্যা ছিল তার,
একে একে চলিয়া গিয়াছে,
মাতা গেছে, শেষ স্নেহ ছিল যে পিতার,
সেটুকুও কাল আজ হরিয়া নিয়াছে।

এ সংসারে আর কেহ নাই
দুখিনীর অশ্রু মুছাইতে,
পতিহারা, পিতাহারা, নাহি তার ভাই,
এ জগতে কেহ নাই তারে বুঝাইতে।

কি নিয়া সে করিবে সংসার—
ভাবে আর ফেলে অশ্রুজল,
যে দিকে তাকায়, দেখে—কেবল আঁধার,
ভাবনায় অভাগিনী হয়েছে বিকল।

মৃত পিতা কোলেতে করিয়া
উর্দ্ধমুখে চেয়ে আছে বালা,

অশ্রুসিক্তা, মাঝে মাঝে "কি হলো" বলিয়া
ভগবানে জানাইছে হৃদয়ের জ্বালা।
'ওগো ওগো পৃথিবীর লোক,
শুয়ে আছ বিলাস-শয্যায়,
বুঝেও কি বুঝিবে না অনাথার শোক,
তোমরা থাকিতে তার হবে না উপায় ?
কাল তার যে ধন হরেছে,
সে ধন সে ফিরে নাহি পা'বে,
কিন্তু যেই অশ্রুধার নয়নে রয়েছে
তোমার আমার স্নেহে সে ত মুছা যাবে।
এস করি অনাথায় স্নেহ,
অশ্রুনীর তাহার মুছাই,
ঝেড়ে দিই অনাথার ধূলামাখা দেহ,
কেহ বা ভগিনী হবে, কেহ হব ভাই!
অভাগিনি! ছাঁড় মৃত পিতা,
ধরে রেখে নাহি ফল আর,
শেষ-কার্য্য কর এবে সাজাইয়া চিতা,
যে জীবনে এত মায়া—এই ফল তার!

দুঃখ-উদযাপন।

আমি একা !
এত বড় পৃথিবীতে মোরে নাথ দেখিবার,
কেহ নাই, হায়, ওগো এ তোমার কি বিচার ?
সবাই ত খায় দায়,
সবাই ত গান গায়,
সবারি ত মুখে হাসি, মোব মুখে হাসি নাই,
মাথা গুঁজিতেও হায় স্থান আমি নাহি পাই।

আমি একা !
আমাব আমার বলে জগতে যা কিছু ছিল,
নিদয় কঠিন কাল বুক চিরে কেড়ে নিল।
রত্ন হরিয়াছে চোর,
হয়েছে জীবন ভোর,
প্রবঞ্চিত হইয়াছি আপন জনেব কাছে,
এও কিহে হর্তাবিধি ! তোমার বিধানে আছে ?

আমি একা !
আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু যারা ছিল আপনাব.
বলিতে আমার কেহ এ সংসারে নাহি আর।
ছাড়িয়াছে তারা আজ
গুছাইয়া নিজ কাজ,
মানুষ বলিয়া তারা তবু দেয় পরিচয়,
এও কি তোমার বিধি—বল প্রভু দয়াময় ?

আমি একা !

আকাশ আমার ঘর, শয্যা মোর দূর্ব্বাদল,
সমীরণ খাদ্য মোর, পান করি নদীজল।
এতেও জীবন-ভার,
বহিতেছি অনিবার,
এখন তোমার প্রাণ দয়া করে ফিরে নাও।
সহিতেছি বড় জ্বালা এবে মোরে ছুটি দাও।

আমি একা !

অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, তবু লোকে করে দ্বেষ,
এও কি তোমার বিধি—বল বল পরমেশ !
শুনিয়াছি লোক-মুখে
একা যে পড়িয়া দুখে
তোমার শরণ লয়, বন্ধু তুমি হও তার,
তবে ত আমার তুমি, একা আমি নহি আর।
একা আমি নহি আর, বন্ধু তুমি নারায়ণ,
তুমি যার আপনার, দুখ তার উদ্‌যাপন।

জিজ্ঞাসা।

কেন এত ভালবাসা,
কেন এত আঁখিজল ?
কিসেরি বা এ নিরাশা,
কিসে উঠে হলাহল ?

তুমি কি আমার মত,
বেদনা পেয়েছ প্রাণে ?
আমার যে দুখ কত—
কভু কি ভেবেছ মনে ?
তবে কেন ভালবাসা,
তবে কেন আঁখিজল,
তবে কেন এ নিরাশা,
প্রাণে তোলে হলাহল ?
একলা পড়িয়া আছি,
যাইনি ত কার' কাছে ;
তবে কেন বাছি বাছি
ফিরিবে আমার পাছে ?
ভালবাসা—ভালবাসা,
কেবল মুখের কথা ;
মুখে দাও কত আশা,
বুঝ কি মরম-ব্যথা ?
তোমার মনের মত
যদি না হইতে পারি ;
করিবে হৃদয় ক্ষত,
বচন-আয়ুধ মারি।
তার চেয়ে আছি ভাল,
একলা এ নিরজনে ;
কেন গো আগুন জ্বাল
বৃথা আশা দিয়ে মনে ?

আমার মনের আশা—
পার কি গো পুরাইতে ?
স্বার্থশূন্য ভালবাসা,
পার কি আমায় দিতে ?

চ'টে গেছি।

কিছু আর বলিব না
কথা আর কহিব না,
একটী কথার তরে এত অভিমান !
কিছু আর বলিব না—মলি হুই কাণ।
আমার কি প্রাণ নাই,
আমার কি মান নাই,
যা কিছু—তোমারি সব, এও ত অন্যায় !
আমার কি প্রাণ নাই—বল ত আমায় ?
কাঁদিতে তুমিই জান,
কাঁদাতে তুমিই জান,
মনে কি ভেবেছ তুমি আমি তা' পারি না ?
কাঁদিতে তুমিই জান, আমি কি জানি না ?
যদি বা থাকিত দোষ,
তা' হলে সাজিত রোষ,
মিছে দোষ ধ'রে কেন হও ভাজা-ভাজা,
যদি বা থাকিত দোষ লইতাম সাজা।

ভাল ত অনেকে বাসে,
হাসিও অনেকে হাসে,
তুমি ভাব ভালবাসা নাহি কারো আর,
ভাল ত অনেকে বাসে—এ যে অত্যাচার!
কোন কালে কোন কথা,
বলেছিনু খেয়ে মাথা,
তাই নিয়ে কিচি কিচি ক'রে হ'ল ভোর,
কোন কালে কোন কথা ব'লে আজ চোর!
সহিতে তা পারিলে না,
সাধিতেও ভুলিলে না,
সাধিতে জগতে শুধু আমিই কি র'ব,
সহিতে তা পারিলে না, আমি কেন সব?

আমি কি এতই হীন,
এতই কি পরাধীন,
উঠাবে বসাবে তুমি ঘুরাবে চরণে,
আমি কি এতই হীন তোমার নয়নে?
দেখ কি করিব আজ,
কিসেরি বা আর লাজ?
করেছ আমারে তুমি বড় জ্বালাতন,
দেখ কি করিব আজ, বুঝিবে তখন।
আর গান গাহিব না,
বার-বার সাধিব না,
পায়ে ধ'রে সেধে সেধে গিয়াছি যে হেরে,
আর গান গাহিব না র'ব চুপ্ করে।

বাঁশী আর বাজাব না,
আর কাছে ডাকিব না,
ভেবেছ কি মনে তুমি—আবার ডাকিব ?
বাঁশী আর বাজাব না, জলে ফেলে দিব।
থাক তুমি মানে ব'সে,
থাক আপনার রোষে,
আর কথা কহিব না—প্রতিজ্ঞা করেছি,
থাক তুমি মানে বোসে,—আমি চ'টে গেছি।
যাও—কথা কহিও না,
যাও—কাছে আসিও না,
যাও সরে যাও, আমি নির্ম্মম হয়েছি।
যাও কথা কহিও না—আমি চ'টে গেছি।
থাক্ পড়ে ভালবাসা,
রাখি না কাহারো আশা,
কোমল হৃদয়খানি কঠিন করেছি,
থাক্ পড়ে ভালবাসা, আমি চ'টে গেছি।
বড় চ'টে গেছি—-আমি ভারী চ'টে গেছি।

তাই ত—কি লিখি ?

শিশুকালে দাগিয়াছি মাটির উপরে,
তার পর তালপাতে, কালী মেখে মুখে হাতে
মাথায় পাগ্‌ড়ী 'ঙ' আদি কত স্বর ক'রে,
নানা মতে নানা ছাঁদে লিখেছি কৈশোরে।
সে লেখাতে কি আনন্দ ছিল যে তখন,
কি এক পবিত্রভাব, কি যে মধুময় ভাব,
ফুটিত হৃদয়-মাঝে কুসুম মতন,
লেখনী পারে না তাহা করিতে বর্ণন।
উৎসাহ আসিত প্রাণে সে লেখা শিখিতে
"লেখা পড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই,"
এ মন্ত্র জাগিত প্রাণে এ লেখা শিখিতে,
করিতাম প্রাণপণ এ মন্ত্র সাধিতে।
সেই লেখা শিখে আজ দাসত্ব-শৃঙ্খল,
হয়েছে জীবন-সার, উপায় নাহিক আর
দাসত্ব করিয়া তবে মিলে অন্নজল,
ছুটেছে আশার নেশা হইয়া বিফল।
যদি কাব্য লিখি, লোকে ক্রয় নাহি করে,
লাভমাত্র উপহাস, গালি খাই রাশ, রাশ,
যদিও না দোষ থাকে, তবু দোষ ধরে,
লেখা শিখে এ-কালেতে পেট নাহি ভরে।
প্রেম-পত্র লিখিতেও সাহস না হয়,
একালে ললনাকুল পদে পদে ধরে ভুল,

পাশ্চাত্য শিক্ষায় তারা করে দিগ্বিজয়,
তাদের আঁটিয়া উঠা মোর সাধ্য নয়।
অথচ লেখাটা চাই, না লিখিলে অন্ন নাই,
অন্ন পেতে অন্নকরী লেখাটুকু লিখি
তাহাতেও অন্নাভাব, তাই ত—কি লিখি?

মহাপ্রশ্ন।

প্রভু! বল মোরে ভাল বাস কিনা?
তুমি প্রিয়তম!
তাই করযোড়ে জিজ্ঞাসি তোমায়
নাথ! বল মোরে ভালবাস কিনা?
অনুগ্রহ নাহি চাই,
দয়ার ভিখারী নই,
জোরের সম্পর্কে আমি তোমায় সুধাই,
দেব! বল মোরে ভালবাস কিনা?

আমি তোমা ছাড়া কা'রেও জানি না।
তুমি প্রিয়তম!
তাই করযোড়ে জিজ্ঞাসি তোমায়
নাথ! বল মোরে ভাল বাস কিনা?
তুমি বিশ্ব গড়িয়াছ
তুমি মোরে সৃজিয়াছ
বেশ জানি তুমি মোরে সকলি দিয়াছ,
তবু বল—ভালবাস কিনা?

আপনার ব'লে কাহাকে মানিনা।
তুমি প্রিয়তম,
তাই করযোড়ে জিজ্ঞাসি তোমায়,
নাথ! বল মোরে ভালবাস কিনা?

তুমিই পরম পিতা,
তুমি জগতের পাতা,
অনাদি অনন্ত তুমি ব্রহ্মাণ্ডের ধাতা,
তবু বল ভালবাস কিনা?

আমি অন্য কিছু জানিতে চাহিনা।
তুমি প্রিয়তম,
তাই করযোড়ে জিজ্ঞাসি তোমায়,
নাথ! বল মোরে ভালবাস কি না?
তোমারি নদীর জল,
তোমারি গাছের ফল,
প্রদানিছে এ জীবনে শান্তি অবিরল;
তবু বল ভালবাস কি না?

আমি এমনি কি করেছি সাধনা?
তুমি প্রিয়তম,
তাই করযোড়ে জিজ্ঞাসি তোমায়,
নাথ! বল মোরে ভালবাস কিনা?
আমার সুখের তরে
সুধীর মলয় ঝরে,

রবি শশী উদে মুদে, ফুল ফুটে থরে ;
তবু বল ভালবাস কিনা ?

আমি করমের ধারও ধারিনা।
তুমি প্রিয়তম,
তাই করযোড়ে জিজ্ঞাসি তোমায়,
নাথ! বল মোরে ভালবাস কিনা ?
তোমায় হৃদয়ে ধরি',
যা' করাও তাই করি,
সুযশ, কুযশ তায় হয় বিশ্ব ভরি' ;
তাই বল---ভালবাস কি না ?
হৃদি-স্থিত হৃষীকেশ !
বল, বল, ভালবাস কিনা ?

পুলক।

দৃষ্টিপথে আসে যবে সে বদনখানি,
শিরায় শিরায় বহে
তাড়িত-প্রবাহ যেন,
আমার আমিত্ব টুকু কোথা চলে যায়,
হৃদয়ের ভাবগুলা হয় নানাস্থানী।
লঘু হতে লঘু হয় তনুটী আমার ;
যেন কোন মন্ত্র বলে
জনমে বিস্তৃত পাখা,

যে বলে বিহগ উড়ে অনন্ত আকাশে ;
আমারো তখন হয় সাধ উড়িবার।
সাজারু-কাঁটার মত দেহে লোমাধলী,
কি এক অজানা সূত্রে—
উন্নত-মস্তক হয় ;
ভাবাবেশে স্মৃতি যেন বিস্মৃতি-সাগরে—
অপার আনন্দ-বেগে পড়ে যায় ঢলি'।
সাধ হয় গলা ধ'রে বলিবারে কথা ;
কিন্তু মুখ নাহি ফুটে,
এ যে গো কেমন ভাব !
বর্ণনায় প্রকাশিত কিছুতে না হয় ;
প্রকাশের চেষ্টা হয় সকলি অযথা।

বিমুক্ত জীবন।

অবিশ্রান্ত প্রেম-বায় সুন্দরি, তোমার
জীবন-গঙ্গায় মোর তরঙ্গ তুলিত ;
সে তরঙ্গে ভাসি' ভাসি'
প্রেমের সমুদ্রে আসি'
পড়িয়াছি—বুঝিতেছি প্রেমের সংসার।
বিশ্বের সমগ্র প্রেম হেথায় মিলিত।
কি ছার ইহার কাছে মানবের প্রেম,—
স্বার্থভরা মরীচিকা—তীব্র জ্বালাময়।

হেথা নাই ছলা কলা,
এ প্রেমে নাহিক মলা,
উদার উন্নত প্রিয়ে! এ অনন্ত প্রেম;
এর কাছে আমাদের প্রেম কিছু নয়!

সুন্দর বা অসুন্দর যা' কিছু ধরায়,
এ প্রেমে সবার আছে সম অধিকার;
নাহি কোন ভেদাভেদ,
নাহি দ্বেষ, হিংসা, খেদ,
যত চাও—তত পাও, নাহি বাধা তা'য়,
এর নাম বিশ্ব-প্রেম—অনন্ত—অপার।

বসন্ত-সমীর যবে বহিত ধরায়,
পূর্ণিমা-নিশায় ঢালি' প্রেমের মদিরা;
কত কথা কহিতাম,
কত গান গাহিতাম,
কত আলাপন হ'ত তোমায় আমায়,
গাইত কতই গান তোমার সখীরা।

স্মৃতি আজ বলিতেছে তাহা ছেলেখেলা,
ব্যক্তিগত প্রেম সেই—প্রথম সোপান।
উচ্চ—উচ্চতর স্তরে
যতই উঠিবে পরে,
বিশ্ব-প্রেম দেখাইবে বিশ্বনাথ-লীলা;
প্রেমের নাহিক সেথা আদান প্রদান।

যদি দেখায়েছ প্রিয়ে, প্রেমের সাগর,
এস ডুবি দুইজনে সে গভীর তলে।
অস্তিত্ব ডুবিয়া যা'ক,
অহঙ্কার হোক খাক,
ভাবিবনা কা'রে আর আপনার পর,
মুছা'ব সবার অশ্রু আপনার ব'লে।

বসন্ত-পবন আর জোছনা-যামিনী,
বিহঙ্গম-তান আর কল্লোলিনী-গান,
প্রিয়ার কুন্তল-পাশ,
বিরহের হা-হুতাশ,
ভাঙ্গা-ভাঙ্গা মেঘ আর ভৈরবী রাগিণী,
আর উচাটন মোর করিবেনা প্রাণ।

পেয়েছি নূতন পথ,—নূতন জীবন,
আর কেন ক্ষুদ্র প্রেমে বাঁধা প'ড়ে থাকি ?
পরের সেবায় প্রাণ,
সতত করিব দান,
এস প্রিয়ে ! জীবনের এই করি পণ,
জীবন-কর্ত্তব্য যেন নাহি থাকে বাকি।
বিমুক্ত জীবন যদি পাইয়াছি আজ
এস—দুইজনে করি জগতের কাজ !

কপালের লেখা।

হৃদয় গলিয়া বয়,
নয়নের ধারা মম,
উছলি' উছলি' যথা শিখর-বাহিনী।
আতঙ্কে শিহরে প্রাণ,
নিঝুম অসহ ব্যথা
সহি অবিরত আমি দিবস যামিনী।
নীরবে জাহ্নবী-বুকে
মিশা'য়ে এ অশ্রুধারা
জীবনের সাধ যত ডুবা'য়ে দিয়েছি।
আসিয়া অবনীমাঝে,
ভাসিয়া নয়ন-জলে,
কপাল-লিখন যাহা সব পুঁছিয়াছি।
প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা,
শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, মায়া,
বিভু যদি না দিতেন এ উদার প্রাণে ;
থাকিতনা কোন জ্বালা,
আমিও লোকের মত—
নাহি তুলিতাম কোন কথা মোর কাণে।
যা' হবার হ'য়ে যেত,
ডুবিত কি না ডুবিত
প্লাবনে সমগ্র মহী,—থাকিত না জ্ঞান ;

স্বার্থভরা আশা লয়ে,
বেঁচে থাকিতাম আমি,
অন্তরেতে করিতাম শুধু স্বার্থ-ধ্যান।
বাজিত না প্রাণে তবে —
মরমের স্তরে স্তরে
প্রিয়জন-উপহাস, মিত্র-অবহেলা ;
যারে আমি বাসি ভাল,
পারিত না সে ত' কভু
লইয়া এ ক্ষুদ্র প্রাণ করিবারে খেলা।
অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর—
অনন্ত উদ্দাম শক্তি
করিতে নারিত তবে এত হীনবল।
অণু অণু রেণু কণা,
তারাও আমার চেয়ে—
আমার সমষ্টি চেয়ে অধিক প্রবল
এত কি করেছি দোষ,
হে বিভু ! তোমার পদে,
যাহাতে করেছ মোরে এতই কাঙ্গাল !
অলক্ষিত আকর্ষণে,
একটু একটু ক'রে
ভাঙ্গিতেছ ধীরে ধীরে হৃদয়-জাঙ্গাল।
যা' করেছ সেই ভাল,
তুমি হে মঙ্গল-ময়,
তোমারি চরণ-ধ্যানে কাটাইব দিন

যোগীর উদার ধ্যানে,
মায়া মোহ সব ভুলে,
সুখে দুখে সমভাবে র'ব উদাসীন।
জরা, মৃত্যু, স্বার্থভরা—
এ মোহিনী ধরণীর
বিষের বাতাস আর গায়ে মাখিব না;
তোমারি অনন্ত ধ্যানে
মজিয়া থাকিব সদা,
ভালবাসা-বুভুক্ষার যাতনা র'বে না।
তোমারি দর্শিত পথে
মনোরথে চালাইব,
কর্ত্তব্যসাধনে সদা হ'ব যত্নবান্।
শতধা-হৃদয়টীকে
শতধারে চালাইব,
মুছাইতে শোকার্ত্তের সজল নয়ান।
হ'বে যে আমার মত,
প্রদানিতে শান্তি তা'রে,
পরাণ খুলিয়া দিব ক'রে গলাগলি;
মলিনতা দূরে যাবে;
স'রে যাবে হৃদি-ব্যথা,
ছোঁয়াছুঁয়ি হ'য়ে যবে হ'বে বলাবলি।
এতদিন এই গান,
কেন না শিখা'লে প্রভু,
কেন বা—না দেখাইলে তব জ্যোতিরেখা?

অথবা তুফানে ফেলে,
শিখাইলে নীতি তব,
এই বুঝি—এই বুঝি কপালের লেখা !

তুমিত আমার ?

ভেঙ্গে গেছে ঘুম,
বুঝিয়াছি সব,
স্বপনের ঘোর নাহিক আর ;
সংসারের ধূম,
জগত-বিভব,—
ছায়াবাজি-সম, কিছু নাহি সার।
রবি, শশী, তারা
গগনে প্রকাশে,
ফুটে ফুলচয়, সুবাস ছড়ায় ;
নির্ঝরিণী-ধারা
ভূধরের পাশে,
পাখীর কুজন—সেও স্বপ্নপ্রায়।
প্রেমের প্রতিমা—
জীবন-সঙ্গিনী
সুমধুর ভাষে সে যে কথা কয় ;
জীবন-গরিমা—
পুত্র কন্যা গুলি,
যে পীযুষ ঢালে সেও কিছু নয়।

সহায় সম্পদ,
ধন, জন, মান,
অজানা কারণে যাহা কিছু পাই;
তুচ্ছ সে সকল,
স্বপনের জাল,
জাগ্রত-নিদ্রায় ঘুরিয়া বেড়াই।
খেলার পুতুল,
ছিনু যে গো আমি,
নিমেষের তরে পড়েনি ত মনে;
তুমিই যে মূল,
তুমিই যে স্বামী,
জগদীশ! প্রভু! ভুলিনু কেমনে?
কোথা দীননাথ,
আসন্ন সময়,
যেতে হ'বে এবে ভেদিয়া আঁধার;
করি' প্রণিপাত,
জিজ্ঞাসি তোমায়,
বল—বল প্রভু, তুমি ত আমার?

গদ্যাংশ।
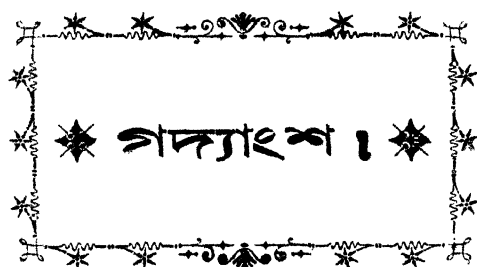
মানস-সরোবর।

আবেগে।

কে বলিবে আমি দুঃখে আছি? আমি বেশ নাচি, বেশ গাই, বেশ আমোদ করি; আমার ধন আছে, মান আছে, যশ আছে; আমার পিতা আছে, মাতা আছে, ভাই আছে, ভগিনী আছে, বন্ধু আছে, বান্ধব আছে; আমার রূপ আছে, যৌবন আছে, সৌন্দর্য্য আছে, মাধুর্য্য আছে; আমার স্নেহ আছে, মমতা আছে, প্রীতি আছে, প্রেম আছে, ভক্তি আছে;—আমার সব আছে। তবু মনে হয়, আমার একটী জিনিষ নাই। কে বলিবে কি তাহা? সেই জিনিষটীর অভাবে আমি যেন অন্তঃসারশূন্য। আমার লোক আছে, বল আছে, গরিমা আছে,—তথাপি আমি অনাথ; আমার গৃহ আছে, তবু আমি আশ্রয়হীন; আমার নদী আছে, কূল আছে, তবু আমি মরুভূমে। কে বলিবে—আমি কেন এমন?

আমার বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, ধর্ম্ম আছে, তবু আমি বিদ্যা-বুদ্ধি-ধর্ম্ম-হীন। আমার হাসি পায়—তথাপি আমি হাসিতে চাইনা; আমার লোকালয়ে থাকিতে ইচ্ছা হয়—

তবু আমি থাকি না ; নৃত্য গীতে আনন্দ উপভোগ করি, তবু তাহা ভাল লাগে না। কে বলিবে আমি কেন এমন ?

এখন যেন আমি কেমন হইয়াছি। সকল বিষয়েই যেন হা হুতাশ! জনাকীর্ণ স্থানে থাকিতে যেন আমার কষ্ট বোধ হয়; বন্ধুর সহিত বাক্যালাপ করিয়া যেন পরিতৃপ্ত হই না ; মাতার অমিয় স্নেহসম্ভাষণে যেন আর তেমন শান্তি পাই না ; পিতার অকৃত্রিম ভালবাসায় যেন কর্কশতার গন্ধ পাই ; ভগিনীর লোকদুর্ল্লভ ভালবাসাতেও যেন কঠোরতা মিশ্রিত দেখি। সবই যেন বিষ, সবই যেন গরল। কে বলিবে—আমি কেন এমন ?

বন্ধুত্ব আমার অকৃত্রিম। সে বন্ধুত্বে কুটিলতা নাই, কৃত্রিমতা নাই, জোয়ার নাই, ভাঁটা নাই,—বর্ষার গাঙ্গের মত একটানা। বন্ধু আমার সম্বন্ধে ভ্রাতা, ভালবাসায় ভার্য্যা, শিক্ষায় গুরু, দীক্ষায় শিষ্য, ব্যবহারে কুটুম্ব, আজ্ঞাপালনে ক্রীতদাস ; আমার মরুভূমে কল-কল্লোলিনী, স্নিগ্ধতায় নিশামণি, নিরাশায় আশা, আঁধারে আলোক, পবিত্রতায় গঙ্গা, কোমলতায় কুসুম। বন্ধুর আমার এত গুণ! কিন্তু তাহাতেও যেন আর সুখ পাই না। কে বলিবে আমি কেন এমন ?

আমার পত্নী পতিব্রতা, পুত্র প্রাণপ্রতিম, আত্মীয়স্বজন অতি আপনার। তবু তাহারা আমার মনের মত হয় না। কে বলিবে—আমি কেন এমন ?

আমার চন্দ্রকিরণে শান্তি নাই, কোকিলের কুহুরবে বিরহ নাই, মঙ্গলবাদ্যে উৎসাহ নাই, মোক্ষচিন্তায় বৈকুণ্ঠ নাই, তীর্থে ভাগীরথী নাই, বৃন্দাবনে যমুনা নাই ; কে আমার বিশ্বাস-ঘাত করিল ? আমার আকাশে মেঘ নাই, বিদ্যুতে চপলতা নাই,

গগনপথে আলোক নাই, অরণ্যে বিটপী নাই, বিদিত পথে পথ নাই, বাপীতটে তৃণ নাই, রসালে রস নাই, জ্ঞানপথে নেত্র নাই; কে আমায় নেত্রহীন করিল? আমার রাজ্যে রাজা নাই, রাজা থাকিলে প্রজা নাই, প্রজা থাকিলে সুখ নাই, সুখ থাকিলে শান্তি নাই; কে আমার এমন দুর্দ্দশা করিল? আমার হৃদয় বিশুষ্ক, প্রাণ কণ্ঠাগত, শরীর বিচ্যুতপ্রায়; কে আমায় এমন করিল? আমি কেন এমন হইলাম? হৃদয়হীন হৃদয় বলিতেছে, মানব! তোমার দুর্দ্দশার কারণ—সমাজের কুটশাসন! ভগবন্! একি যথার্থ, না আমার হৃদয়েরই দুর্ব্বলতা? বুঝি বা দুইই!!!

প্রাণের আলোক।

আমার পোড়া চক্ষে, জগৎ-সংসার অন্ধকার! অন্ধকার বলিয়া সুকৃত কি দুষ্কৃত করিলাম, বলিতে পারি না;—কিন্তু অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার—মসীবর্ণ। দিনকরের প্রখর রশ্মিজাল গগনতলে প্রকাশমান হইয়া ভূমিতল উদ্ভাসিত করে বটে; কিন্তু তাহাতে অন্ধকার ঘুচে না। রাত্ পোহাইলে হাতের চিন্তা, দাঁতের চিন্তা, পেটের চিন্তা। চিন্তায় মহাচিতা; মহাচিতায়—মহাধূম—সুতরাং অন্ধকার। সূর্য্যদেব আমার আঁধার ঘুচাইতে পারিলেন না। একবার নিশাকর ঠাকুরকে সাধিয়া দেখি, তিনি কি করেন? আলোকটী বেশ—স্নিগ্ধ, মনোহর! রূপ দেখিয়া ভুলিলাম। এ রূপ দেখিতে দেখিতে—ভাবিতে ভাবিতে কতরূপ মনে পড়িল! "চাঁদামামা টিপ্ দিয়ে যা," বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, শারদী পূর্ণিমা, পত্নীর প্রেমপূর্ণ ভালবাসা, ছাই ভস্ম কত কি মনে পড়িল। ভাবিতে ভাবিতে

চক্ষু বুঁজিয়া আসিল। কেমন, অন্ধকার—মোহান্ধকার নয় কি? শৈশবে বরং আলোকের ছিটে ফোঁটাও দেখিতে পাইতাম। সেই আলোকে আপনাকে আপনি দেখিয়া হাসিতাম, কাঁদিতাম; আবার হাসিতাম, আবার কাঁদিতাম! কিন্তু হায়, সে কাল ছাড়িয়া এখন কি কালে পড়িয়াছি যে, আপনাকে আপনি চিনিতে পারি না? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ আমার কি হইল?' এখন যে দেখিতেছি, সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে।

যা'ক্, এখন আলোক খুঁজি—যদি কিছু পাই। বনের দিকে একটা ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাইতেছি; উহার ভিতর একটী আলেখ্যও দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সেটী "ধর্ম্ম ও যোগ"। যাই, 'নির্জ্জনতাই ভাল। নির্জ্জন স্থানে, নিবিড় বনে, যদি আলোক পাই, তবে কোলাহলপূর্ণ সংসারের বিলাসকাননে পড়িয়া অন্ধকারে স্খলিতপদ হই কেন? এতদিনে আমার অন্ধকার সরিয়া গিয়াছে, আমি প্রাণের আলোক পাইয়াছি। চেষ্টা করিলে সংসারে থাকিয়াও এ আলোক পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সুদুর্লভ। প্রাণের আলোক, প্রাণে মায়া-মমতা-হীন হইয়া ভগবৎ-চরণে প্রাণ সঁপিতে পারিলে, অনতিবিলম্বে লাভ করা যায়। এতদিন অহঙ্কারে তাহা বুঝিতে পারি নাই; জীবন তাই অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। আজ অহঙ্কার গিয়াছে, ঘটনস্রোতে পড়িয়া নির্জ্জনতা আশ্রয় করিয়াছি, বিলাস-লালসা ত্যাগ করিয়াছি, তাই অন্ধকার সরিয়া গিয়াছে; প্রাণের আলোক পাইয়াছি।

প্রকৃতির শোভা নাই।

আমি মনে জানিয়াছি, প্রকৃতির শোভা নাই। বেশ মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিয়াছি, বেশ বুঝিয়া বুঝিয়া দেখিয়াছি, বেশ চোখ চাহিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু প্রকৃতির শোভা আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। চাঁদ উঠে, ফুল ফুটে; কিন্তু মিলাইয়া যায়, শুখাইয়া যায়; জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ বলিতে পারে না,—কেন? রবি হাসে, কিন্তু আবার প্রচণ্ডমূর্ত্তি হয়, আবার দীনের দীন হইয়া অস্তাচলশায়ী হয়—শত্রু হাসায়। একি আবার শোভা! তারা মিট্ মিট্ করে, আলোকের তেজ নাই, চপলতা নাই, যেন জড়-ভরত—চাহিয়া আছে ত চাহিয়াই আছে। যেমন উষার বাতাস বহিল, অমনি তাহারা পলাতক হইল। ভীরু, কাপুরুষ! একি প্রকৃতির প্রকৃতি? রাম! রাম! ঘৃণা ধরাইয়া দিয়াছে। তরুলতা বনজঙ্গল বৃদ্ধি করে, বন্যপশুর আবাসস্থান করিয়া তুলে। দিবারাত্র ভৈরব হুঙ্কার তাহাদের তলদেশ হইতে উত্থিত হয়। তাহাতে প্রাণে আতঙ্ক জন্মায়। গাছের কাছে যাইতে ইচ্ছা করে না, গাছের দিকে চাহিতে ইচ্ছা করে না। প্রকৃতি যদি সহানুভূতি না করিল, সমবেদনা না দেখাইল, তবে তাহার শোভা কিসের? ভূধর মমতাহীন, প্রস্তর কঠিন, রাক্ষসাকার, লতা-গুল্ম-অরণ্যানীতে পরিপূর্ণ; তাহার নিকট যায়,—কাহার সাধ্য? সাগর রত্ন ধারণ করে, বড় লোক; ফুলিয়া ফাঁপিয়াই আছে—কাহাকেও দৃক্‌পাত্ করে না। অবসর পাইলে রত্ন হরণ করে; জীব-জীবন আপন জীবনে মিশাইয়া লয়; তাহার শোভা থাকিলেও আমার চক্ষে শোভন হইবে কেন? নদী কুলু কুলু তানে হাসিতে হাসিতে বন্যা আনে,

দুকূল ভাসাইয়া দেয়, অবশেষে সাগর-অঙ্গে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। যে নির্দ্দয় হাসি হাসিয়া পরের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহার আবার কিসের শোভা? প্রস্তর পায়ে ফুটে, বালি-কণা চোখ কাণা করে,—তাহারা শত্রু। মেঘ অবিশ্রান্ত ধারায় সসাগরা পৃথিবী জলপ্লাবিত করে, পথে বাহির হইবার উপায় রাখে না। যেমন আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি! জীমূতগর্জ্জন সে প্রকৃতির পরিচায়ক। মুখে আগুন! বিদ্যুল্লতা ছিনি মিনি খেলে, ধাঁ ধাঁ লাগাইয়া দেয়। একবার আলো দেখাইয়া ঘনঘটা বাড়াইয়া দেয়। কি ভীষণ! বজ্রপাত গর্ভিণীর গর্ভপাত করে, সমগ্র জগৎ-সংসার বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে! তাহার আবার শোভা কিসের? শিশির, নিশার অত্যাচার দেখিয়া কাঁদে। শর্ব্বরী-সহায়ে দুর্জ্জন আপনার পথ পরিষ্কার করে। রজনীকে পাইয়া পশুকুল ভীষণ আরাবে ভক্ষ্যবস্তু আহরণে নিযুক্ত হয়। শিশিরের তাহাতেই নয়ন ঝরে। যে কাঁদিতে শিখিয়াছে, তাহার শোভা থাকিবে কেমন করিয়া? সমীরণ খোস্‌মেজাজে যুবতীর ঘোমটা সরাইয়া দেয়, কাঁচুলী দোলায়, কুন্তল নড়ায়, পুষ্প-সৌরভ হরণ করে, গৃহস্থের ঘরে উঁকি মারিয়া গোপ্য কথা শ্রবণ করে। বদ্‌ মেজাজে ঝড় তুলে, ঘর ভাঙ্গে, গাছ উড়ায়, নৌকা ডুবায়। সে যেমন নির্লজ্জ, তেমনি ক্রোধ-পরবশ। নির্লজ্জেরও শোভা নাই, ক্রোধীরও শোভা নাই। প্রকৃতির অনুচর বিহগ, সেও প্রকৃতির অনুরূপ। ভোর হইতে না হইতেই ঘুম্‌ ভাঙ্গাইয়া দেয়, আহারীয় সামগ্রী ফেলিয়া রাখিলে, গাছের আগায়-ভাঙ্গা বাড়ীর ছাদে লইয়া যাইয়া, গা-ঝাড়া দিয়া, ডানা মেলিয়া, ঠোঁট দুইখানির মধ্যে পুরিয়া দেয়। দিবাকর-অস্তগমনকালে কাকলীতে মরা-কান্না তুলে

রাত হইলে রাতকাণা। যে চক্ষুহীন, সে কি শোভন হইতে পারে? মানব স্বার্থপর, কথাই নাই; পশু, পশু,—পশুত্বে শোভা নাই। কীট—অতি ক্ষুদ্র—জন্মে আর মরে; তাহার আর কত টুকু শোভা? পতঙ্গও তাই। সরীসৃপ, অনেকেই বিষধর; যাহাদের বিষ নাই, তাহারাও অন্ততঃ স্পর্শনীয় নহে, সুতরাং শোভার আধার নহে। প্রকৃতির কোন অনুচরই আমার চক্ষে শোভনীয় নহে। তাই বলিতেছিলাম, প্রকৃতির শোভা নাই।

ফিতা।

ফিতা! তুমি রমণীয়, কমনীয়, আমার জ্ঞানের অতীত, বুদ্ধির অতীত, বুঝি বা মহৎ হইতেও মহৎ! তুমি সুন্দরীর আলুলায়িত কুন্তলবন্ধনে আদরের সামগ্রী, শাটীর অলঙ্কার, অলঙ্কারেরও অলঙ্কার। তুমি বিনামা-রক্ষক, শোভাবর্দ্ধক, পাদুকা-সেবক; তুমি শিশুর চিত্ত-বিনোদক, আফিসের কাগজ-পত্র-বন্ধন-কারক, উপাধিভূষিত জনগণের পদক-ধারক; তুমি বালিসের ওয়াড়ের মুখ-বন্ধক, মশারি-শাসক, দ্রব্যাদি-বাহক, ফ্যান্সি ড্রেসের নায়ক; তুমি অশেষ উপকারী। তুমি যদি না জন্মিতে ফিতা! তবে কুলমহিলা, কুঞ্জমহিলা, বেলকুল মহিলা কেশবন্ধন করিতে পারিত না; তাবিজ, বাজু, চিক্ প্রভৃতি অঙ্গে আঁটিতে পারিত না; শ্বেতাঙ্গগণ শ্রীপদকমলে বুট্ চড়াইতে না পারিয়া বাবু-ভায়াদের তাহার মধুর আস্বাদ বুঝাইতে পারিত না; মেমপুঞ্জ বিনামা-বিহনে কর্দ্দম-পথে কষ্ট পাইত, কোমল চরণে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইয়া রক্তারক্তি

হইত,—সাহেব কর্ত্তারা সহস্র খান রুমাল পাতিয়া দিয়াও ঠেকাইতে পারিত না ; বাবুগণের ফাটা চরণ আরও ফাটিত, বেলা আট ঘটিকা হইতে না হইতেই, "নাকে মুখে" লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে গুঁজিয়া তাহারা, ঘরের লক্ষ্মী, দশের লক্ষ্মী, দেশের লক্ষ্মীকে দেশছাড়া করিবার সুবিধা পাইত না ; আপ্‌শোষে হয়ত বা বদ্‌হজমে তাহাদের মৃত্যু ঘটিত ; শিশু "আঙ্গা ফিতে ঘোলার লাস, কলিতে" না পাইয়া মনক্ষুণ্ণ হইত ; সৌখীন বাবুকুল ঘড়ী ঝুলাইতে না পাইয়া দম্‌ ফাটিয়া বেদম হইত ; আফিসে 'রেড্‌ টেপ'—ব্লু টেপ' বিহনে কাগজপত্র "হণ্ডুল মণ্ডুল" হইত, বুঝিবা আফিসগুলায় চাবি তালা পড়িত ; অশেষগুণপণা দেখাইয়া, চাঁদার খাতায় নাম সহি করিয়া, সরকার বাহাদুরের খয়ের-খাঁ হইয়া যাঁহারা পদক পাইয়াছেন, তাঁহারা পদকখানি গলায় বাঁধিয়া লোকসমাজে বিচরণ করিতে না পাইয়া, হাপুস নয়নে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেন। তুমি না থাকিলে ফিতা, মুখ-খোলা বালিসের সহস্র "ছার"—এমন যে সুন্দর সুঠাম দেহখানা—ক্ষার করিয়া ফেলিত ; মশারি খাটাইতে না পারিয়া খট্টাঙ্গের অপমান করা হইত ; লোকে জিনিস পত্র গোছগাছ করিয়া বাঁধিতে পারিত না,—কোথায় কি উড়িয়া পুড়িয়া যাইত ; ফ্যান্সি লেডীগণ, ফ্যান্সি পোষাকে কৃশ তনুখানি শোভিতা করিয়া ফ্যান্সি প্রেমে, ফ্যান্সি নাচে, হস্ত পদ ছুঁড়িতে না পাইয়া "আমসী" হইয়া যাইত ; আরও কত—কতকি প্রলয়কাণ্ড ঘটিত, কে বলিতে পারে ? তাই বলিতেছিলাম, তুমি আমার বুদ্ধি ও জ্ঞানের অতীত।

কিন্তু, তুমি মহৎ ! আমি তোমার যত কুৎসাই করি না কেন, তুমি তথাপি মহৎ। তুমি সাবিত্রীর কেশ বন্ধন করিয়াছিলে,

সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতির অঙ্গে স্থান পাইয়াছিলে, অশ্ব-বল্গারূপে সুভদ্রার করে শোভা পাইয়াছিলে,—তুমি মহৎ! তুমি নাগরূপে চন্দ্রশেখরের কটিদেশ বন্ধন করিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণের ধড়া স্পর্শ করিয়াছ, অর্জ্জুনের কিরীট শোভিত করিয়াছ,—তুমি মহৎ! তুমি হরিনাম কবচের শৃঙ্খল, গীতার বন্ধনরজ্জু, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুঁথিরক্ষক,—তুমি মহৎ! সিজার, নেপোলিয়ান, ওয়াসিংটন, ওয়েলিংটন, কুম্ভসিংহ, প্রতাপ, আকবর, প্রভৃতি তোমায় হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন,—তুমি মহৎ! ব্যাস, কালিদাস, মিল্টন, সেক্স্‌-পিয়ার প্রভৃতি তোমায় হয়ত কার্য্যোপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন,—তুমি মহৎ! তুমি মহৎ হইতেও মহৎ! আধুনিক সমাজে লোকে তোমায় যে ভাবে নাড়া চাড়া করে, তুমি তাহার একান্ত অযোগ্য। তুমি যাঁহাদের আশ্রয় পাইয়া ধন্য হইয়াছিলে, তাঁহারা মহা-প্রস্থান করিয়াছেন। তুমিও তাঁহাদের অনুসরণ কর নাই, কেন ফিতা? তাহা হইলে ত এত অবনতি ঘটিত না। অথবা নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে!!

অন্ধকার।

একজন ধনবান্‌, তাঁহার নায়িকা মূর্চ্ছাগতা হওয়ায়, চক্ষে অন্ধকার দেখিয়াছিলেন। একজন দরিদ্রের পিতৃবিয়োগ হয়, সেও চক্ষে অন্ধকার দেখিয়াছিল। অনেকে ঋণের জ্বালায় অন্ধকার দেখে; অনেকে চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দিতে না পারিয়া অন্ধকার দেখে; অনেকে ঋণ না পাইয়া অন্ধকার দেখে। কেহ দুঃখে, কেহ শোকে, কেহ রাগে, কেহ রোগে, কেহ হিংসায়, কেহ

ঘৃণায়, কেহ মায়ায়, কেহ ভালবাসায়, কেহবা অতি তুচ্ছ কারণেও চক্ষে অন্ধকার দেখে। উজ্জ্বল দিবালোকে বসিয়াও তাহাদের চক্ষে অন্ধকার বোধ হয়। অতএব আলোকের অভাবই যে অন্ধকার, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। বরং বলা ভাল, জ্ঞানের অভাব—অন্ধকার; যাহার হৃদয়ে জ্ঞান-সূর্য্য উদিত হইয়াছে, তাহার আর কিছুতেই অন্ধকার লাগে না। হৃদয়ের যে কোন "পরতে" অন্ধকার লুকাইয়া থাকুন না কেন, জ্ঞানসূর্য্য তাহা সরাইয়া দেয়, চক্ষের ধাঁ ধাঁ ঘুচাইয়া দেয়। এ সূর্য্যের রশ্মিজালে জিহ্বার কঠোরতা গলিয়া যায়, কর্ণের আবর্জ্জনা পুড়িয়া যায়, পঞ্চেন্দ্রিয় আলোক পাইয়া সুপথে চলে, ষড়্রিপু ঘর্ম্মাক্ত হইয়া জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এ আলোকে ভক্তি-সূর্য্যমুখী ফুটে, স্নেহ-পাপিয়া ডাকে, প্রেম-প্রভাতী-মলয় বয়, সহানুভূতি-টহলদার রাগিণী আলাপ করে; তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, আলোকের অভাব—অন্ধকার নয়,—জ্ঞানের অভাবই অন্ধকার! যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, সে রবিশশী অনুদিত হইলেও তিমিরাবৃত নহে, কারণ জ্ঞান-সূর্য্যে তাহার জীবন আলোকময়।

এই কারণে আমার মনে হয়, সৌখীন বাবুদের সাধের বৈঠকখানায় "অস্লার" "ডিট্মার" প্রভৃতি শাদা-চামড়া-ওয়ালার শাদা আলোকে প্রাণের অন্ধকার ঘুচে না। প্রাণের অন্ধকার ঘুচাইতে হইলে জ্ঞানালোকের প্রয়োজন। বুঝ আর নাই বুঝ, বিশ্বাস কর আর নাই কর, কথাটা কিন্তু কঠিন-সত্য।

জ্ঞানালোক পাইতে হইলে শক্তির আবশ্যক, অধ্যয়নের আবশ্যক, অধ্যবসায়ের আবশ্যক, কর্ত্তব্যপালন আবশ্যক, হিতাহিত বিবেচনা আবশ্যক। এ সকলের মূল—সদ্গুরু। তাহা তোমার

নিজের মনও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিস্তর শক্তির প্রয়োজন। একবারে সে শক্তিতে শক্তিমান্ হওয়া দুর্ঘট। যতদিন সে শক্তি লাভ না হয়, ততদিন একজনের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ উচিত। তার পর শক্তিলাভ, তার পর মুক্তিলাভ। একবার মুক্ত হইলে, অন্ধকারের আর ভয় থাকে না। সে অবস্থায় গৃহিণীর গঞ্জনা-ভয়ে অন্ধকার দেখিতে হয়না, পেটের দায়ে অন্ধকার দেখিতে হয়না, পিতৃ-মাতৃ-আত্মীয়-বন্ধু-শোকে—সংসারের প্রবঞ্চনায় কিছুতেই অন্ধকার-বোধ হয় না। তখন জীবমাত্রেই আপনার, জগৎ আপনার। অন্ধকারই তখন আলোক। অন্ধকারেই শান্তি আসে। অন্ধকার তখন পুণ্যময় দেশ, অন্ধকার তখন সত্ব রজঃ তমঃ গুণের আধার।

মহাকালীর রূপ এই অন্ধকার। এই অন্ধকারে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছিল, এই অন্ধকারে মহাপ্রলয় ঘটিয়াছিল, এই অন্ধকারে তুমি আমি, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, প্রভৃতির জন্ম, আবার এই অন্ধকারেই তাহাদের লয়। মোহান্ধকার ঘুচাও; বুঝিবে—অন্ধকারেই আলোক।

মিলন ও বিচ্ছেদ।

সংসারের ঘোর আবর্ত্তনে ঘটনাস্রোত কখনও "একঘেয়ে" হয় না, অহরহঃ ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে। আজ যে সুখী, কাল সে দুঃখী; আজ যে সুস্থ, কাল সে রোগী; আজ যে যুবা, দিনকয়েক পরে সে বৃদ্ধ। আবার, এই আমোদ প্রমোদ করিতেছি, ক্ষণপরেই গাম্ভীর্য্য আসিয়া জুটিল; এই এক জনকে ভাই বলিলাম, পরমুহূর্ত্তে সে

আমার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে নিরয়গামী করিল, এই প্রেমালাপ চলিতেছে, ক্ষণপরে সে আলাপে হলাহল পড়িল, শেষে শোণিত-স্রোত! আলাপের পর বিবাদ, বিবাদের পর আলাপ; দুঃখান্তে সুখ, সুখান্তে দুঃখ,—এ যেন প্রকৃতির নিয়ম। ইহাই সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই এ ঘাত-প্রতিঘাত ওতপ্রোতভাবে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু মিলন ও বিচ্ছেদ—এই দুইটা তরঙ্গ আজকালের সংসারে যেন একটু সংসারের প্রতিকূলে গমন করিয়াছে। অন্ততঃ এমনটা এ অধীনের বিশ্বাস। সেই কথাই বলিব।

পূর্ব্বকালে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন দেখিতে নানা জনপদ হইতে লোক আসিত। এখন তাহা হ্যাক্—থু। বিবাহ-সভায় পূর্ব্বে "হরগৌরী-মিলন" হইত। এখন বরযাত্রিগণ "সেন্ট্" মাখিয়া, "পাম্প্-সু" চড়াইয়া, সিল্কের পাঞ্জাবী উড়াইয়া, সৌখীন "ষ্টিক্" ঘুরাইয়া লুচি খাইতে যায়, বরকর্ত্তা "রূপচাঁদ" বুঝিয়া লইতে যায়, বরের দাদা, মামা ও পিসে -ঘড়ী, চেন, আঙ্গটি প্রভৃতি দান-সামগ্রী হেপাজৎ করিতে যায়,—তাহারা হরগৌরী-মিলন চায় না—সে মিলন হয়ও না। বিবাহ নামটাই কেবল আছে। নবীন দম্পতী এখন অনেক নবীন ভাষার নবীন ভাবে বিভোর হইয়া মিলন কথাটার অর্থবোধ করে না—বা করিতে চায় না। এখন স্বাধীন প্রেমের আধিপত্য—প্রাণের মিলন উঠিয়া গিয়াছে। হিন্দুকুলবধূ, একালে, লিপিকুশলতা লাভ করিয়াছে; স্বামীর প্রবাসাবস্থাতেও তাহারা বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করে না। চিঠিতেও তাহাদের কথাবার্ত্তা চলে। বিজ্ঞানের উন্নতিতে এখন ছায়াচিত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। স্বামী, স্ত্রীর নিকট হইতে সহস্র ক্রোশ ব্যবধানে

থাকিলেও উভয়েই উভয়কে প্রতিনিয়ত দেখিতে পায়। চোখের মিলন-রূপ নেশায় বিচ্ছেদ ব্যথাটা বড় অনুভবের মধ্যে আসে না। এখন হিন্দুর মেয়ে শ্বাশুড়ির কাছে স্বামীর কথা পাড়িয়া বিচ্ছেদযাতনা ভুলে; হিন্দুর ছেলে দাদার কাছে "প্রাণের মিলন"—অবশ্য স্ত্রীর সহিত—জ্ঞাপন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না:—কোনও কোনও গুরুজন আবার সে আগুনে ফুৎকার দানও করেন। মিলন এবং বিচ্ছেদটা এখন "ছকৃড়া নকৃড়ার" মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। বিচ্ছেদ! তুমি তবু প্রেমপত্রে স্থান পাও; কিন্তু মিলন! তোমার স্থান কোথায়? বলিতেও লজ্জা হয়।

প্রাচীনকালে মিলনে পুণ্য ছিল, ধর্ম্ম ছিল; এখনকার মিলনে বড় জোর সুখ আছে। পূর্ব্বে নায়ক নায়িকার মধ্যে একটা কি-যেন-কি-ভাব ছিল, এখন যতদূর বুঝিতে পারি, সে-যেন-সে-ভাব নাই। যদি থাকে, তবে তাহা সভ্য-জগতের বাহিরে। এখন যেন সবই সাজান, সবই মৌখিক। উদার প্রাণের উদার মিলন, কই, আজকালকার কোন পুস্তকেও পাই না, দৃষ্টিপথেও পড়ে না, কর্ণগোচরও হয় না। বরং যাহা দেখি, তাহা অনুদার—স্বভাব-চিত্রের বিকৃত অবস্থা। এখনকাব বিদুষী কুমারীগণকে শিবপূজা করিয়া মনোমত পতি পাইতে হয় না। কেহ স্বাধীন প্রেমে মজিয়া পায়, কেহ অর্থহীন পিতার "বাস্তুভিটা" বন্ধক দেওয়া অর্থে পায়, কেহ আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ লইয়া পায়; আর যা'র যথেষ্ট জোর কপাল, সে ধনবান পিতার "রূপচাঁদের ঝন্‌ঝনানিতে" পায়। এখনকার কালে সাধনাও নাই, সিদ্ধিও নাই। পূর্ব্বে সাধনাও ছিল, সিদ্ধিও ছিল। তখন সীতাদেবীর জন্য রামচন্দ্র ছিলেন, সাবিত্রীর জন্য সত্যবান ছিলেন, দময়ন্তীর জন্য নলরাজ ছিলেন, চিন্তার জন্য শ্রীবৎস ছিলেন; তখন সুভদ্রার অর্জ্জুন ছিল,

উত্তরার অভিমন্যু ছিল, বেহুলার লখীন্দর ছিল; তখন শকুন্তলা জন্মাইত, দুষ্মন্ত জন্মাইত; মিরন্দা জন্মাইত, ফার্ডিনেণ্ড জন্মাইত; জুলিয়েট জন্মাইত, রোমিও জন্মাইত। এখন মিলন ও বিচ্ছেদ-স্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে। তাই আর তেমনটী দেখিতে পাওয়া যায় না।

তখনকার বিচ্ছেদে আর এখনকার বিচ্ছেদে কি তুলনা হয়? তখন স্বামীবিরহে স্ত্রীলোক নীরবে কাঁদিত, নীরবে ভাবিত, নীরবে পতিপদোদ্দেশে পূজা করিত। তখন গুরুজনের সেবা করিয়া সতী পতিবিচ্ছেদ ভুলিত; কর্ত্তব্য পালন করিয়া কুলকামিনী মন হইতে বিরহ-যন্ত্রণা দূর করিত; তখন সাবিত্রী, সত্যবান-বিরহে যমের সহিত কথা কহিয়া মৃতপতিকে পুনর্জ্জীবিত করিত; দময়ন্তী বনে যাইত, বেহুলা—পূতিগন্ধময় মৃত স্বামীর চরণোপান্তে বসিয়া, "ভেলা" বাহিয়া অসাধ্য সাধন করিত; তখন রামচন্দ্র, সীতা-বিরহে মর্ম্মন্তুদ বিলাপ করিতেন; যক্ষরাজ মেঘমালাকে দূত করিয়া হৃদয়ের মর্ম্মব্যথা জানাইত; তখন ফার্ডিনেণ্ডের মনে মিরন্দা ভিন্ন তিলোত্তমার মত শত সুন্দরীরও স্থান পাইত না; রোমিও—জুলেয়েটের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিত; জুলেয়েট্—মৃত পতির জিহ্বাস্থিত হলাহল পান করিয়া পার্থিব দেবতার অনুসরণ করিত। সে কালে প্রেম-গঙ্গায় শান্তির তুফান ছুটিত, বিচ্ছেদ-বাতাস তখন আশাপাল "ভরা" করিয়া দিয়া জীবনতরী, পুনর্ম্মিলন অথবা মহামিলন-ঘাটে পৌঁছাইয়া দিত। একালে ভালবাসার গাঙ্গে "চড়া" পড়িয়াছে, কুবাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে,—সে কালের কিছুই নাই; আছে যৌবন-প্রভঞ্জনের যোজনব্যাপী শব্দমাত্র। তাই বুঝি উপেক্ষার অট্টহাসি—হো—হো—হো !!!

ভয়।

জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া একটী পাগলিনী গান গাহিতেছিল—

কেবল আশার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হ'ল।

সে আলুলায়িতকুন্তলা, অৰ্দ্ধনগ্না, আভরণহীনা। দুই হাতে কেবল দুই গাছা শাঁখা ছিল। শরীরের গঠন কোমল, বর্ণ গৌর, কিন্তু অযত্ন-রক্ষিত বলিয়া বর্ণের তেমন উজ্জ্বলতা নাই। মুখাবয়ব সুন্দর, তাহার উপর কেশগুচ্ছ পড়িয়া অধিকতর শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। সে যখন গাহিল—

নিম্ খাওয়ালি চিনি ব'লে, কথায় করে ছল—

তখন শতধারে তাহার আঁখি-ধারা বহিতেছিল; চন্দ্রালোকে তাহা মুক্তাফলের ন্যায় বোধ হইতেছিল। কণ্ঠের স্বর তীব্র-মধুর, করুণ, এবং একটু ধরা-ধরা। যখন সে

এখন সন্ধ্যা হ'ল্ কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল—

বলিয়া গীত সমাপ্ত করিল, তখন সে ধীরে ধীরে উঠিল, ধীর-পদ-বিক্ষেপে বনান্তরালে চলিয়া গেল।

এই গান শুনিয়া, এই দৃশ্য দেখিয়া, আমার সঙ্গের লোকটী— বলিতে ভুলিয়াছি, আমার সঙ্গে একজন লোক ছিল—থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। আমি ভাবে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম, তাহাকে লক্ষ্য করি নাই। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে পাগলিনীকে প্রেতযোনি ভাবিয়া তাহার সর্ব্বশরীর শিথিল হইয়া কাঁপিতেছিল।

এ এক রহস্য! একজন নির্জ্জনে, চন্দ্রালোকে স্নাত হইয়া, পাগলিনীর স্বভাব-সুন্দর রূপ দেখিয়া, তাহার গান শুনিয়া,

মোহিত চিত্তে ভাব-সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, আর একজন ঠিক্ সেই সময়ে, সেই স্থানে, সেই অবস্থায় রক্তমাংসবিশিষ্ট একটী স্ত্রীলোককে দেখিয়া প্রেতিনী অনুমানে ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়াছিল।

আমার বিবেচনায় সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিলে আর ভয় থাকে না। শিশু অজ্ঞ বলিয়াই যে দীপশিখায় হস্ত নিক্ষেপ করে, এমনটা আমার মনে হয় না। তাহার সঙ্গে যেন আরও কিছু আছে। দীপালোক দেখিয়া সে হয়ত মনে ভাবে, 'এটী বেশ ধপ্ ধপে শাদা—খেলিবার জিনিষ'। আমি ইহাকে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি বলি। সেই কারণে শিশুর অগ্নিদগ্ধ হইবার ভয় থাকে না। পুড়িয়া যাইবার ভয় দেখাও, সে আর দীপ-শিখা ধরিবার চেষ্টা করিবে না। তখন তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধির স্পৃহা কমিয়া গিয়াছে। মাটির ঢেলা, তোমার আমার নিকট, হাত কাল—কাপড় ময়লা করিবার ভয় জন্মাইয়া দেয়, কিন্তু শিশুর নিকট তাহা আদরণীয়। শিশু মনে মনে বোধ হয় মাটির ঢেলাকেও সুন্দর দেখে। যে যাহা মনের মত মনে করে, সে তাহাতে হঠাৎ ভয়ের কারণ দেখে না। তুমি গোলাপ ফুল ভালবাস, কণ্টকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও তুমি গোলাপ তুলিতে ছাড়িবে না। এস্থলে তোমার কণ্টকাঘাতে ভয় নাই। কারণ তুমি গোলাপের সৌন্দর্য্যে অভিভূত। বারবিলাসিনী যদি তোমার মন হরণ করে, তুমি সমাজের ভয় করিবে না, দরিদ্র হইবার ভয় করিবে না, মর্য্যাদার ভয় করিবে না, মহাজনের ভয় করিবে না,—কিছুরই ভয় করিবে না; কারণ তাহার সৌন্দর্য্যে, তুমি তখন বিমোহিত। পুস্তক পাঠে, তোমার রাত্রি-জাগরণের ভয় নাই, স্বাস্থ্য-ভঙ্গের ভয় নাই, কারণ পাঠ্য-বিষয় তোমায় সৌন্দর্য্য-

রসে ডুবাইয়া দিয়াছে। সৌন্দর্য্যে মাদকতা আছে। যতক্ষণ সে মাদকতা থাকিবে, ততক্ষণ ভয়ের আবির্ভাব হইবে না।

এখন বলিব, জ্ঞান-বৃদ্ধি ভয়ের একটা কারণ। শিশুর ছোট্ট হাতখানি একবার পুড়িয়া গেলে, সে আর অগ্নি-সন্নিধানে যাইবে না। "হাইল্যাণ্ডার গোরা" সুন্দরবনের ব্যাঘ্র কাণ ধরিয়া আনিতে পারে, কিন্তু ব্যাঘ্রের স্বভাব বুঝিলে আর সুন্দরবনের ছায়া মাড়াইবে না। যে একবার কর্দ্দমাক্ত পথে আছাড় খাইয়া আঘাত পাইয়াছে, সে কর্দ্দম দেখিলেই পা টিপিয়া টিপিয়া চলিবে। যে মৎস্য একবার জাল-ছেঁড়া হইয়াছে, সে আর সহজে জালের ধারে আসে না।

ভয় অনেক প্রকারের আছে। যে কাপুরুষ, তাহার ভয়—হয়, দৈহিক শক্তির অভাবে, না হয়, মানসিক শক্তির অভাবে। চোরের ভয়—ধরা পড়িলে জেল খাটিতে হইবে; রোগীর ভয়—ঔষধ খাইতে তিক্ত লাগিবে; পড়ুয়ার ভয়—গুরুমহাশয়ের বেতের লক্‌লকানি; আর অনুগত স্বামী—স্ত্রীকে ভয় করে,—তাহার মুখের "তোড়ে" আর শতমুখীর 'বহরে"। লোকে মৃত্যুভয় করে—অন্যে মৃত্যুকালে "হেঁচ্‌কী" তুলিয়া বিকটমূর্ত্তি হইয়াছিল বলিয়া,—আর এক ভয়, তাহারা নিজেরা পাপী। যাহারা পুণ্যবান, তাহারা মৃত্যুর ভয় রাখে না, কারণ মৃত্যুতেও তাহারা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করে।

এখন দেখা যাইতেছে, ভয়ের নানা কারণ এবং ভয়ও নানা প্রকার। মূল কারণ কিন্তু এক—হয়, সরল বিশ্বাস কিংবা সৌন্দর্য্য উপলব্ধির লোপ; না হয় শক্তির অভাব। জ্ঞানবৃদ্ধিতে যে ভয় জন্মায়, তাহা অনেক স্থানেই মঙ্গলজনক; কিন্তু শক্তির অভাবে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহা অতীব ঘৃণার্হ। শেষ কথা, ভয়—কল্পনার উপর নির্ভর করে।

মানুষ-লাঠি।

আমার মনে হয়, মানুষ লাঠির জাত। বাঁশ-ঝাড়ে লাঠি যখন সহজাবস্থায় বিরাজ করে, তখন সে ভিক্ষুকের পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ এবং কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য ভিন্ন অন্য কোনও বৃহৎ কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয় না। কিন্তু যখন তাহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া, জলে ভিজাইয়া, তৈলাক্ত করিয়া, রন্ধনশালার ধোঁয়া খাওয়াইয়া তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন তাহার প্রতাপ দেখে কে? সেই ক্ষুদ্র বংশখণ্ডের নিকট তখন শাণিত তরবারিও মস্তক অবনত করে। তেমনি মানুষ। মানুষ যখন কেবল মানুষ—দ্বিপদ জন্তু-বিশেষ—তখন তাহাদের দ্বারা উদর নামক ভীষণ গহ্বর পরিপূরণ ভিন্ন অন্য কোনও কার্য্যই প্রায় সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। কিন্তু যখন জ্ঞান-তরবারিতে সাধারণ মনুষ্যের ঝাড় হইতে বিভিন্ন হইয়া বিবেক-তৈলে মর্দ্দিত হইয়া, সংসার-রূপ রন্ধনশালার সহিষ্ণুতা-ধূমে আচ্ছাদিত হইয়া, মনুষ্যনামের যোগ্য হয়, তখন তাহার কেমন প্রতাপ! লাঠির ঠক্‌ঠকানিতে শত্রুর যেমন হৃদয় কম্পিত হয়, মনুষ্যের মনুষ্যত্বে তেমনি হিংসা, দ্বেষ, লোভ, মোহ, প্রভৃতি সুদূরে পলাইয়া যায়; লাঠির তাড়নায় যেমন বিষয় রক্ষা হয়, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব তেমনি প্রেমরাজ্য স্থাপন করে—বিশ্বজগৎ আপনার করে। লাঠি প্রজা বশ করে, খাতক বশ করে, মহাজনের ভয়ের কারণ হয়; মনুষ্যত্ব হৃদয় বশ করে; দয়া, মায়া, স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি, ভালবাসা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিদ্যা, বিবেক প্রভৃতিকে খাতক করে; কাম ক্রোধ প্রভৃতির মহাজনি কাড়িয়া লয়। লাঠির সদ্ব্যবহার হইলে, তাহার তুলনা নাই; মনুষ্যত্বও অতুলনীয়। লাঠি পাকিতে না পাইলে যে

বেউড় বাঁশ—সেই বেউড় বাঁশ ; মনুষ্যত্বের অনুশীলন না হইলে, মানবনামেরও মূল্য নাই। কথাটা রূপক হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে সত্য নিহিত আছে। লাঠি লাঠিত্ব লাভ করিলে তাহার ভয়ে প্রবল-পরাক্রান্ত মানসিংহের ন্যায় সেনাপতিও শঙ্কিত হয় ; তুমি মনুষ্যত্ব লাভ কর—দুর্জ্জন তোমায় ভয় করিবে, সজ্জন তোমায় ভক্তি করিবে, ভালবাসিবে, তোমার কার্য্যে বুক পাতিয়া দিবে। যে যষ্টি কুকুর প্রভৃতির ভীতির কারণ, তাহা বাবুবর্গের হস্তে শোভাবর্দ্ধক মাত্র, কিন্তু তাহার যথার্থ আদর নাই। তোমার মনুষ্যত্বে যেন সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা এবং ধর্ম্মের ভাণ না থাকে ; তাহা হইলে অন্ধ লোক-সমাজে আদর পাইলেও পাইতে পার ; তাহাদেব চক্ষে শোভনীয় হইলেও হইতে পার ; কিন্তু চক্ষুষ্মান লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইবে; ভগবানে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে তাঁহাব নিকটও দায়ী হইবে, হৃদয়েব নিকটও দোষী হইবে। লাঠিয়ালের হস্তের লাঠি শোভাযুক্ত নহে, কিন্তু কর্ম্মনিপুণ। কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া—তীক্ষ্ণধার অসিকেও তাহার নিকট খণ্ড খণ্ড হইতে দেখিয়া—লোকে আশ্চর্য্যচক্ষে তাহার পানে চাহিয়া থাকে ; তুমি শোভনীয় হইবার আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিও ; দেখিবে—সৌন্দর্য্য তোমার আপনি আসিবে, তোমার গুণ ও গৌরবে লোকে তোমায় দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে। লাঠির দাসত্ব নাই, সে চির-স্বাধীন, তুমি মনুষ্যত্ব লাভ কর, তোমারও দাসত্ব থাকিবে না। লাঠি বেউড়-বাঁশের প্রপৌত্র হইয়া যদি এতাদৃশ ভয় ও ভক্তির আধার হয়, তুমি মনুর বংশধর হইয়া, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ইচ্ছাময় প্রভু হইয়া, যদি মানুষ-লাঠি সাজিতে পার, ভাব দেখি—তোমার স্থান কোথায় ? স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র এই বাঁশের লাঠিকে পারিজাত বৃক্ষের "ঠেক্‌নো"

করিয়া অমর হইয়াছেন। 'তুমি মানুষ-লাঠি,—মনুষ্যত্ব লাভ করিলে নন্দন কাননের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইতে পার। বিশ্বাস হয়, চেষ্টা করিয়া দেখিও। তবে নিবেদন এই, বাঁশের লাঠির সঙ্গে তোমার তুলনা করিলাম বলিয়া রাগ করিও না। লাঠির মত কঠিন হইতে পারিলে তোমার আমার অন্ন খায় কে ভাই?

নাম-রহস্য।

জন্মদিন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মানুষের নামের অনেক পরিবর্ত্তন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নাম হইল খোকা কিংবা খুকী। তারপর নাম হয় পুঁটে, কেলো, খাঁদা, বোকা, কিংবা এই প্রকারের আর কিছু। অন্নপ্রাশনের সময় একটা রাশনাম হয়, পরে ঐ নাম বিগ্‌ড়াইয়া যাইয়া রামের স্থানে 'রেমো' হয়, শ্যামের স্থানে 'শ্যেমো' হয়, জীবনের স্থানে 'জীবে' হয়, ললিতের স্থানে 'নলে' হয়, প্রভাবতী 'পিবি' হয়, প্রফুল্ল 'পি-পি' হয়, শ্যামাসুন্দরী 'শ্যামি' হয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। যাহার ভাগ্য বিশেষ সুপ্রসন্ন, তাহারই কেবল রাশনাম পরিবর্ত্তিত হয় না। তবে যাহার নাম যতই সুন্দর হউক, বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে, সম-পাঠী বালকগণ তাহা উদ্ভট করিয়া ফেলে।

বিবাহকালে নাম হয়,—"বর"—"কনে"। যাহার কন্যা অতি কুৎসিতা, সে হয়ত অবজ্ঞা করিয়া কন্যাকে "কাল্টি," "গুই," প্রভৃতি শব্দে অলঙ্কৃতা করিত। কিন্তু বিবাহের সময় "কাল্টি", মৃণালিনী নামে পরিচিতা হইয়া "কনের" আসন অধিকার করে; "গুই"

সুশীলা হইয়া বসে, "খাঁদি" শরদিন্দুনিভাননা হয়। পেলারাম খুদিরাম, প্রভৃতি তখন "জামাইবাবু" হইয়া ভাল ছেলেটির মত উঠিতে বলিলে উঠে, বসিতে বলিলে বসে,—অনুমান হয়, জীবনে তাহারা "ভাজা মাছটিও" উল্টাইয়া খাইতে শিখে নাই। চারিচক্ষে মিলনের পর, "হাবি" "সুরি" "বিন্দি" প্রভৃতি "বড় বৌ" "মেজ-বৌ" "ছোটবৌ" "বৌমা" সাজিয়া শ্বশুরগৃহে চলিয়া যায়; তাহাদের স্বামী নূতন বিবাহের আমোদে অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া বাণবিদ্ধ পক্ষীর ন্যায় "উলট পালট" খায়, আর কবির আসনে বসিয়া, লিপিরচনা-কালে সুশীলাকে "সু" বলিয়া সম্বোধন করে, নীরোজিনীকে "নীর্" বলিয়া কবিত্ব-প্রভা বিকাশ করে। স্বামী মহাশয়েরা আপন আপন অর্দ্ধাঙ্গিনীর নিকট তখন "উনি" "তিনি" "ও" প্রভৃতি রূপে সম্বোধিত হন। যিনি ভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে বিদূষী নারী, তিনি পতি-দেবতাকে উ বাবু (উপেন বাবু), ন বাবু (নগেন বাবু), ম বাবু (মন্মথ বাবু) বলিয়া কবিত্বের প্রজ্বলিত হুতাশন শীতল করেন। বাবুগণ যদি স্ত্রীর কথায় বশবর্ত্তী হইয়া পিতা, মাতা, ও ভ্রাতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, বন্ধুবান্ধবকে বাটীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন, বিধবা ভগ্নীর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাকে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন, তবে সেই পুরুষপুঙ্গব এক নূতন নামের অধিকারী হয়েন। নামটি—"ভেড়ো" "বা ভেড়ুয়া"। পাঠকগণ লক্ষ্ণৌ-বাইগণের সঙ্গে "ভেড়ুয়াকে" "সঙ্গত" করিতে দেখিয়া থাকিবেন। এ সেই জাতের ভেড়ুয়া না তদধিক।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমান্ পীযুষকান্তি—"মেজবাবু" "জেঠা বাবু" "কর্ত্তাবাবু" "শ্বশুর মহাশয়" হন; বিমলা—"মেজবৌ "শাশুড়ী-ঠাকরুণ" "শ্যামার মা" "গিন্নি মা" হন। আফিসের কর্ম্মে কেহ

বড়বাবু, ছোটবাবু, কেরাণীবাবু, ডেপুটীবাবু, তারবাবু, পোষ্টবাবু, নকলবাবু প্রভৃতি হন, কেহ বা বাগান করিয়া বাগানবাবু হন, উকিল হইয়া উকিলবাবু হন, ডাক্তার হইয়া ডাক্তারবাবু হন। চিররুগ্ন হইলে তাহার নাম,—"রোগ্‌না"; অধিক ভক্ষণ করিলে "পেট্‌কো"; অতি দুর্দ্দান্ত হইলে "ডাকাবুকো" প্রভৃতি এ সকল নাম ত আছেই। তার উপর মানুষের আধখানা নাম আছে। মনে কর, তুমি শ্বশুরগৃহে দয়া করিয়া পদার্পণ করিয়াছ। তোমার হৃদয়-তোষিণীর সহচরী কিংবা অন্যান্য প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীগণ তোমায় দেখিতে আসিয়া আপনাঅপনি বলিল—"আহা বিমলির অমুকটি দেখ্‌তে বেশ্‌ হয়েছে, যেন কার্ত্তিকটি।" এস্থলে তুমি পিতৃপিতামহ কিংবা তোমার নিজের নামেও পরিচিত হইতে পারিতেছ না। আধখানি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর নাম, আর আধ-খানিও ধার করা নাম। এমত স্থলে তুমি আমি পূরা নামের অধিকারী হইতে পারি কি? [illegible] আবার শ্বশুরের নামেও পরিচিত হন। তাঁহারা অবশ্য [illegible] মেকী। কোম্পানির চিঁড়িয়াখানায় তাঁহাদের স্থান দিলে মন্দ হয় না। কিন্তু তাঁহারা এরূপ অপদার্থের ভার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিবেন কি?

মানুষ যখন প্রাণবায়ুহীন হইয়া সৎকারের জন্য তোমার আমার দয়ার উপর নির্ভর করে, তখন তাহার নাম "মড়া"। মানবজীবনের এই শেষ নাম। পরলোকে যাইলেও একটা নাম আছে। তাহাকে দেবতা, ভূত বা উপদেবতা বলে। যোগী, ঋষি, সাধু, অসাধু, পণ্ডিত, মূর্খ, প্রভৃতি সকলেই মানবদেহ ত্যাগ করিয়াও নামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না; ইহাই নাম-রহস্য। স্বতঃসিদ্ধ উপায়ে নামের এরূপ বহুলপ্রচার থাকিতেও লোকে নাম কিনিতে পাগল হয়, নামের

জন্য স্বদেশদ্রোহী হয়, নামের জন্য আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করে; ইহাও আশ্চর্য্য, অথবা নামের এও এক রহস্য। এই রহস্য ভেদ করিয়া যে মনুষ্যের কর্ত্তব্য পালন করে, সে পুরুষই হউক আর স্ত্রীলোকই হউক, জগতের ইতিহাসে তাহার নাম অমর; জীবনে মরণে করুণানিদান ভগবান তাহাকে কৃপা করেন। কারণ, নাম-রহস্য তাহাঁকে আর অভিভূত করিতে পারে না, কারণ প্রকৃত মনুষ্যনামে তাহার অধিকার জন্মিয়াছে।

আমি।

বিষম গোলযোগে পড়িয়া গিয়াছি। যখন [illegible] "আমি" বলি, "আমার" বলি, অথচ জানি না—"আমি" কি,—আমি কে? জানি না—আমার কি,—আমার কে? জ্ঞানের উদয় হইতেই "আমি" বলিয়া আসিতেছি; অথচ পিতা, মাতা, ভাই, বহিন, গুরু, শিক্ষক, বন্ধু, বান্ধব, কেহই বুঝাইয়া দিল না—"আমি" কে? সকলকে "আমি" বলিতে শুনিয়াছি, "আমার" বলিতে শুনিয়াছি; তাই আমিও "আমি" বলি,—"আমার" বলি। 'আমার ঘর' 'আমার স্ত্রী,' 'আমার পুত্র', 'আমার অর্থ' এত' ছকড়া নকড়া কথার মধ্যে। কিন্তু একবার ভাবিয়াও দেখি না যে, এই "আমিত্ব" ব্যক্ত করিতে পারা যায় কি না;—"আমি" বলিতে আমার অধিকার আছে কিনা,—আমাতে "আমিত্ব" আছে কিনা?

একদিন মনের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া স্থির করিলাম, দূর হোক ছাই, যখন "আমিত্ব" বুঝিতে পারি না, তখন আর "আমি" বলিব না। কিন্তু তার পরেই আর এক ভাবনা আসিয়া জুটিল,—যদি "আমি" শব্দ ত্যাগ করি, তবে চলিত-ভাষায় "আমার" বুঝাইতে কোন্ শব্দ ব্যবহার করিব? তারপর আর এক গোলযোগ; যদি "আমিত্ব" না বুঝিতে পারিয়া "আমি" শব্দ ত্যাগ করিলাম, তখন "আমার" কথাটা উপায়ান্তরে ব্যবহার করিতে প্রয়াসী হই কেন? কিন্তু শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন:—

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধি র্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥

তবে ভগবান আমাতেও আছেন; তিনিই তবে আমার বুদ্ধি, তিনিই তবে আমার তেজ। যদি এমনই হয়, তবে তাঁহারি শক্তিতে "আমি" "আমার" বলিতে পারি। তাঁহার 'মাং' শব্দে আমাকে "অ[illegible] আমার প্রবৃত্তি হইতেছে। আমি যদি ভগবানের অংশ [illegible]হং' শব্দ প্রয়োগ করিতে দোষ কি? "আমিত্বের" অর্থ বুঝি বা না বুঝি, "আমি" বলিব, কারণ ভগবান বলিয়াছেন। আমি ভগবানের অংশ—ভগবান আমাতে অবস্থান করিতেছেন, অতএব এ শব্দে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু তিনি আবার বলিতেছেন:—

আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

কথাটায় খটমট লাগিয়া গেল। যদি তিনি আমাতেই রহিয়াছেন, তবে আবার তাঁহাকে পাইব কেমন করিয়া? আর তিনি যখন আমাতে অবস্থিত, তখন ত আমি ব্রহ্মলোকেই বাস করি-

তেছি, আমায় আর ব্রহ্মলোকে যাইতে হইবে কেন? জন্মজন্মান্তরে তাঁহার অংশে যখন অংশশালী, তখন বারবার জন্ম-পরিগ্রহই বা করিতেছি কেন? কথাটায় যেন গোলমাল ঠেকিতেছে। তবে একস্থানে শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কাম কামা লভন্তে।

হইতে পারে ক্ষীণ-পুণ্য হইয়া আবার সংসারে আসিয়াছি। কিন্তু ভগবানের অংশ হইতে বিচ্যুত হই নাই। তবে "আমি" না বলিব কেন? তা, না হয় বলিলাম,—ভগবানের উপর "টেক্কা" দিয়া না হয় "আমি' বলিলাম! কিন্তু ভগবান যাহা করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তেমন কার্য্য আমি ভগবানে[illegible] হইয়া করিতে পারি কি? তিনি ইচ্ছাময়, তাঁহার [illegible] হয়, স্থিতি হয়, লয় হয়। আমার ইচ্ছায় কি হয়? [illegible] হাতীর মত খাইতে পারি; বড় জোর—সিম্‌লার ধুতি, চক্‌চকে জুতা, সাটিনের অঙ্গরাখা পরিয়া, গন্ধদ্রব্যে "গন্ধগোকুল" হইয়া গাড়ী চড়িয়া গঙ্গাকূলে বেড়াইতে যাইতে পারি, না হয় চাকুরীস্থলে বড়বাবু হইতে পারি—উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইতে পারি; কিন্তু তাহাও ঈশ্বরানুগ্রহে। তুমি আমি কি "আমি" বলিবার যোগ্য? আমি যদি একটা ভাল কাজ করি, তবে ঢাক ঢোল বাজাইয়া সকলকে জানাইয়া দিই, যে অমুক কাজটা করিয়াছি। কিন্তু তুমি যদি একটা ভাল কাজ কর, তবে তোমার হইয়া ঢাক বাজাইয়া বেড়াইতে কি আমার শক্তি আছে? তখন বরং উল্টা উৎপত্তি। তুমি ভাল কাজ

করিয়াও যাহাতে অপরের চক্ষে নিন্দনীয় হও, তোমার ভাল কাজটাও যাহাতে মন্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ইহা সকলকে বুঝাইয়া দিতে আমি সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত। যাহার "আমিত্বে" অধিকার আছে, সে কি আমার মত নির্লজ্জ, স্বার্থপর, পরনিন্দুক? যে আমিত্বে ডুবিয়া যায়, তাহাব আর সদসৎ জ্ঞান থাকে না, ভাল মন্দ তাহার কাছে তুল্য; নিষ্ঠা বিষ্ঠা, তাহার কাছে তুল্য; তিনি যোগী, তিনি মহৎ, তিনি ঈশ্বর। তোমার আমার 'আমি' বলিতে অধিকার নাই। যাহা বলি, তাহা জোর করিয়া—"ছেঁছড়ামি" করিয়া। এ "আমির" সংসার, অহঙ্কার কেহ ছাড়িতে চায় না, ভগবৎ-পদে কেহ বড় মাথা লুটাইতে চায় না, তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইতে চায় না। তাই "আমি" ছ-কড়া ন-কড়া।

[illegible]নি" লইয়াই কি আমি থাকিতে পারি? যখন [illegible] জন্য আমায় ভৎসনা খাইতে হইবে বলিয়া মনে[illegible] কৌশলে তোমার ঘাড়ে আমার "আমিত্ব" চাপাইয়া দিয়া সাধু সাজিতে চেষ্টা করি। দস্যুর হাতে পড়িয়া প্রাণ হারাইবার উদ্যোগ দেখিলে, দস্যুপ্রবরকে পিতৃপিতামহ সম্বোধনে আমার "আমিত্ব"-টুকু তাহার "তুমিত্বে" মিশাইয়া দিই। গৌরবের স্থলে "আমি" বলি; নিন্দার স্থলে "তুমি" বলি,—প্রাণের দায়ে 'তুমি' বলি। সকলেই বলে,—ধর্ম্ম আমার, পুণ্য আমার; কিন্তু কাহাকেও কি বলিতে শুনিয়াছ—পাপ "আমার"? এ কথা যে বলিতে পারে, হয় সে "আমিত্বে" ডুবিয়াছে, না হয় তাহার "আমিত্ব" ছুটিয়া গিয়াছে।

এ অবস্থায় "আমিত্বে" সুখ আছে, শান্তি আছে, কারণ এ

"আমিত্বে" তাহার বিশ্ব প্রেম লুক্কায়িত আছে। গিরি-নির্ঝরিণীর মত বিশ্বপ্রেম তাহার প্রাণে প্রাণে বহিতেছে। সেই নির্ঝরিণী-নীরে সেই মহাজনের হৃদয়ক্ষেত্র উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হইয়াছে; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যরূপী কীটগণ বিনষ্ট হইয়াছে; তিনি অবিদ্যা নাশ করিয়াছেন; তাই তিনি বলেন,—"পাপ আমার, পুণ্য আমার, ধর্ম্ম আমার, অধর্ম্ম আমার, তোমার পাপেব ভার—আমায় দাও, আমি বহন করিব।" তুমি আমি যে "আমিত্বের" বড়াই করি, এ কথা বলিতে আমাদের সাহস হয় কি? সকলেই বলিতেছে "আমি"—"আমি"; ভাল আমি তবে কোন্ "আমি"? এ "আমিত্ব"-পূর্ণ সংসারে কোন্ "আমি"টী আমি বাছিয়া লই? তাহাব অপেক্ষা "আমিত্বের" নেশা ছুটাইয়াদি, "তুমিত্বের" আশ্রয় গ্রহণ করি, আর পবিত্র হইয়া যোড়করে প্রাণে প্রাণে গাই—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নি[illegible]
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ প[illegible]
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্ত[illegible]
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্র কৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥

প্রাণ ভরিয়া যাইবে, "আমি"র অহঙ্কার ছুটিয়া যাইবে। সংসারী লোকের সহিত কথাবার্ত্তা-ছলে, ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় "আমার" বুঝাইতে 'আমি" বলি, ক্ষতি নাই,—কিন্তু অহঙ্কারবশতঃ "আমি" না বলি। কামনাত্যাগের তুল্য সুখ নাই, অহঙ্কার-ত্যাগের তুল্য

শান্তি নাই! এই দুইটার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে "আমিত্ব" লয় পায়। তখন মনে হয়—

> বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
> নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥